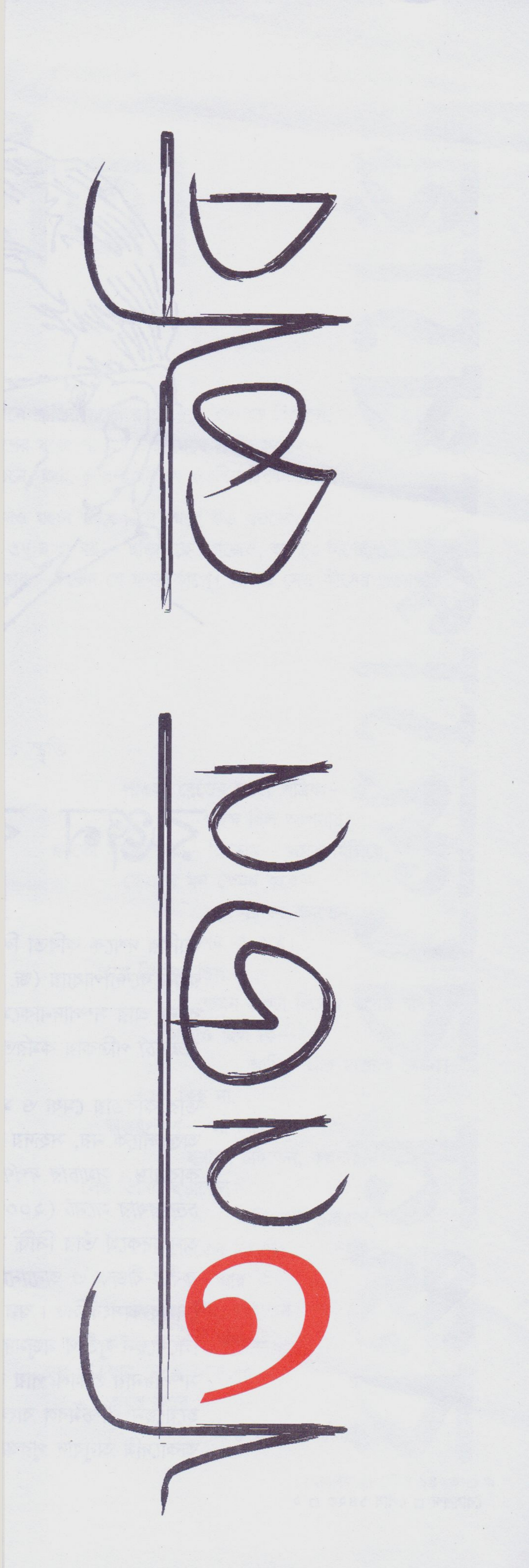
পৌষ ১৪২৩ : জানুয়ারি ২০১৭



রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন কবিতা

পূর্বপ্রকাশিত

আলোচনা : রঞ্জিত সিংহ

সাক্ষাৎকার

তন্ময় মৃধা

নতুন কবিতা

পূর্বপ্রকাশিত

আলোচনা : সোমক দাস

সাক্ষাৎকার

অরূপ আস

নতুন কবিতা

পূর্বপ্রকাশিত

আলোচনা : মৃদুল দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার

কবি পরিচিতি : রাজদীপ রায়

পোর্ট্রেট : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ক্যালিগ্রাফি : অতীন ভট্টাচার্য

বিলম্বিত বোধশব্দ

ঠিক দু-দিন আগে যে-কথাটা ভাবছিলাম, আজ সেটা অভিমন্যু বলেই দিল। অভিমন্যু— অভিমন্যু মাহাত। আমাদের বন্ধু, কবি। বছরে একটাই সংখ্যা, সেটাও যদি সময়ে বের করতে না পারো, তাহলে কাগজ বন্ধ করে দাও। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক হিসেবে, *বোধশব্দ*-র এই তখনও-না-বেরোনো নতুন সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে এসে বিফল হওয়ার হতাশা ওর স্পষ্ট কথায় ঝরে পড়ছিল। ঠিকই, এই পত্রিকা সে-অর্থে ঢাউস নয়, সংখ্যাও বছরে মোটে একটাই— তাহলে এই বিলম্বের কী কৈফিয়ত হতে পারে, সব দায় মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া? নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তি নির্বাচনে যদি ভুল হয়ে থাকে, সে-ব্যর্থতাও তো আমাদেরই। স্বল্প সংখ্যক হয়তো, তবু *বোধশব্দ*-র ডেডিকেটেড এই পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

তবে এতকিছুর পরও আশার কথা হল, এ-লেখা আপনি পড়ছেন মানে, সংখ্যাটি বেরিয়ে গিয়েছে। যাক!

প্রসঙ্গত বলি, যে 'তিনজন কবি' এই সংখ্যায় রইলেন, অনেকেই তাঁদের লেখা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। নতুন করে বলার কিছু নেই। আবার এ-কথাও সত্যি, বাংলা কবিতার বহু পাঠক ধারাবাহিকভাবে এঁদের লেখা পড়েননি। হয়তো কেউ-বা নামটুকু শুনেছেন মাত্র। তাঁদের জন্যও এই তিন কবি সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় মৃধা ও অরূপ আস— এঁরা কাছাকাছি সময়েরই, কিন্তু এঁদের কবিতার ধরনে বিস্তর ফারাক। সেই বৈচিত্র্য এবারের দেড় মলাটে ধরা রইল। আগ্রহীজনের সেখানে প্রবেশ অবাধ।

মুখড়ার শেষে শুভেচ্ছা জানাই কবি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়কে। *বোধশব্দ*-র তিনি নিয়মিত লেখক। তাঁর সাম্প্রতিক সম্মাননালাভের আনন্দে আমরাও শামিল।

সম্পাদক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদক : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত

প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী

যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি

পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ □ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২

বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com

অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া

মুদ্রণ : এস পি কমিউনিকেশনস, কল-৯

ম্যাকাও, উত্তরপাড়া

বন্ধুত্বে : বরুণ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, রাজদীপ রায়
পিনাকপাণি ঘোষ, অরুণাভ পাত্র, সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য, অতীন ভট্টাচার্য
ঋত্বিক মল্লিক, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রসূন মজুমদার ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

বোধশব্দ ৩



রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আশির দশকে কবিতা লিখতে এসে নিজস্ব মনন ও ভাষায় একান্তভাবেই স্বকীয় হয়ে পড়েন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯৬১)। তাঁর জীবন শুধু কবিতা লেখা নয়, কবিতার অনুবাদ, প্রবন্ধ রচনা আর সম্পাদনাকর্মের সঙ্গেও জড়িত। দীর্ঘদিন *প্রতিক্ষণ*-এ কাজ করেছেন। বর্তমানে *ভিন্নচর্চা* পত্রিকায় কর্মরত।

তাঁর কবিতায় মেধা ও মননের দীপ্তির পাশাপাশি বেজে ওঠে শব্দের ধ্রুপদী ধর্ম। শুধু কবিতার অন্তর্লোকে নয়, সহৃদয় সামাজিক হিসেবেও তাঁর কবিতার সমুন্নতি আপন মাধুর্যে উজ্জ্বল। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : *সমাচার দর্পণ* (১৯৮৭), *মায়াবন্দর* (১৯৯২), *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে* (১৯৯৮), *চন্দ্ররেখার সনেট* (২০০৩)। লিখেছেন গদ্যগ্রন্থ *কলকাতার রঙ্গীনীকথা* (১৯৯৪)। এ ছাড়া অনুবাদকর্মে তাঁর সিদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত। রয়েছে দু-টি বই : *কবীর ও তাঁর কবিতা* (১৯৯৫), *কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা* (২০০১)। সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে মুদ্রিত রচনা বিস্তর। সেসব অসংকলিত। স্বল্প ক-টি প্রবন্ধ ও অনূদিত রচনা বিভিন্ন সংকলনভুক্ত। স্বনামে ছাড়াও লিখেছেন সুতীর্থ মজুমদার, সুরঞ্জন পাঠক ও স্বরোচিষ রায় ছদ্মনামে। ১৯৮৪-৮৫ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় কবিতা বিষয়ক পত্রিকা *আত্মবর্গ*। সম্পাদিত গ্রন্থও একাধিক। সম্মানিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লীলা রায় স্মৃতি পুরস্কার (২০০২) এবং সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কারে (২০০৫)।

নতুন কবিতা

শহর

প্রতিদিন যত বাড়ছ নিজের বহরে—
মিলছে না তবু কোথাও তিলেক ঠাঁই,
আশমানে ঘন হোক যত আশনাই—
কথা ঠিকই আছে স্বভাবসিদ্ধ সফরে :
সব পাখিদের একটুকু বাসা চাই,
হাওয়ামহলেও অবাধ রাস্তা চাই।

উইন্ডো-শপিং

বাজার হয়নি আর, দোকান দেখেছ ঢের—
কাচের ওপিঠে কারও মওকা নেই বিরামের।
হিম হাওয়া গায়ে মেখে এলোমেলো চাহনিতে
পসার দেখলে কত, লোকারণ্য চারভিতে,
চিনেছ কি জায়গির, নাগরিক ইনামের?

চলন্ত সিঁড়িতে উঠে, ট্রেনে গিয়ে— পাতালের,
সময় সংক্ষেপ কর, যে-নিয়ম যে-কালের,
গেলেও তখন সেই ফ্লুরেসেন্ট বিপণিতে—
বাজার হয়নি আর।

ছিল কত বস্তুরতি— কে আর তা পায় টের!
ঘুমেও যখন সেই পণ্যশালা জাগে ফের—
তখনও বিপন্ন মুঠি, দৃষ্টি ঘোরে সারণিতে,
মূল্য জেনে সরে যাও দোকানের বিপরীতে,
মৃদু হাসি ছাড়া অন্য পুঁজি নেই, কাঙালের
বাজার হয়নি আর।

পীড়ন

মাছেরা চিৎকার করে বলত যদি— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,
জবাই হওয়ার আগে মুরগি, ভেড়া, বারশিঙা, ছাগল, শুয়োর—
সব জন্তু চায় ত্রাণ, নিজের মৃত্যুর মুখ দেখে,
তবুও অরব দেহে শ্বেতরসই ঝরে যেত— সবুজ হারিয়ে।

গোপনে, প্রকাশ্যে ক্রোধ— একই হত্যা, বিতর্ক বাড়িয়ে
মহানুভবের মতো ভোর এলে অবাক প্রত্যেকে :
উধাও কালচে দাগ— ঘনরক্ত, স্বজনের শবের উপর!
এবং আবার অশ্রু, হাহাকার লুকোয় কোথাও।

শ্মশানে শান্তির মতো রয়ে গেছে হাওয়ায় হিল্লোল,
মারণের যজ্ঞে পাওয়া ভস্ম মেখে সর্বাঙ্গ সফেদ—
আগুনে নজর, চুলে হয়নি যে কতদিন চিরুনিতল্লাশি!

মিলনও মহান ভাবে দিয়ে গেছে কত স্বপ্নভেদ,
জট শুধু মাথা নয়— ছড়িয়েছে মগজেও, অসারে বিভোল;
কী কারণ— কেন যে হৃদয় কাঁপে! আজও সেও কীসের প্রত্যাশী?

কবির স্মৃতি

পাতলা ব্লেডের মতো পত্রিকা—
পছন্দ ছিল আপনার!
হয়তো সুষমা তার— ছিমছাম— সমস্ত মিলিয়ে,
ফেলতে মন কেমন করে—
বরাবর বলতেন,
বিশদ না করে।
তবে কি স্বপ্ন ছিল—
তেমন একটা নিজেই করেন যদি!
মায়াও ছিল কি—
আশিক আর মাশুকে যেমন!
ওসব কিছু না,
অন্তরপুরুষ— আপনার,
হয়তো চাইতেন, কল্পনায়,
সেই তিনিই ছড়াতেন
এলিগ্যান্ট ভাইরাস,
দিতেন নির্বেদ।
আর
এক এক দিন, বলাতেন
দু-একটা সাবধানী কথা—
স্থূল পত্রিকার থেকে আমাদের
অবুঝ নজর
সামান্য তফাতে সরিয়ে।

হেঁশেল

অপেক্ষায় গাঢ় থেকে
ক্রমশ মুক্তির পথে
সাবলীল হয়ে আসে ঝাঁঝের বাতাস—
ট্যাঁড়শ আর ফোড়নের গন্ধে মিশে
খুন্তির কোলাহল নিয়ে
ঘরে ও দালানে।
বন্ধ জানলার কাচে
যেভাবে পতঙ্গ গিয়ে ধাক্কা পায়—
দুরন্ত চড়ুই এসে থমকে পড়ে
পথ খুঁজে এধার-ওধার,
ক্রমে সে আত্মস্থ হয়,
চুপিসারে পালায় কখন—
এ-গন্ধের দশাও তেমন!
মাঝে শুধু হাঁচি আসে—
প্রাণান্ত হাঁচির টান, নাগাড়ে
দু-তিন ঝটকায়—
এরই জন্য
অভিযোগ-তূণ থেকে
বাছাই অব্যয়গুলি ছুটে গিয়ে
রাঁধুনিকে ঘাতক ঠাওরায়।
অথচ সুসিদ্ধ হলে, ওরই ঘ্রাণে
ক্ষুধাও শানায়!

সংসর্গ

উধাও হয়েছে কবে কথার নির্ঝর,
নৌকো সব ছেড়ে গেছে কোন ইশারাতে!
যখন পাঁচেও নয়, কেউ নেই সাতে—
স্বপ্নে দেখা হয়ে গেল বহুদিন পর।
জলটুঙ্গি— পারঘাট— পোড়ো মেটেঘর—
পুবের হাওয়ায় ভিজে কত জল্পনাতে
আশ্রয় ছিল যা সবই, উল্লোল-আঘাতে
হয়ে আছে সেখানেও বিশাল বিবর!
মনে হয়, এতকাল অবমৃশ্য চোখে
দেখা হয়েছিল কিছু অক্ষরের কায়া—
নামরূপ নিয়ে সব ছিল কম-বেশি;
স্পষ্টত হয়নি পড়া। ছিল আবছায়া—
কী মোহে জড়িয়ে এত মূর্খ মনোলোকে :
দূরে-কাছে চেনামুখ— নীরব, বিদেশি।

সরিৎ

নয় সে নির্ঝর—
নির্ঝরিণী কোনো,
পাষাণে ব্যাঘাত ঠেলে
সংসর্পী গতি ওই— বনপথ ধ'রে
জনপদ ছুঁয়ে যেতে
প্রবলসঙ্গমে,
অথচ দর্শনে
সেও তরঙ্গিণী—
হরফের মাঝে তার
বঙ্কিম স্রোতের রেখা
পড়ে আছে—
তনু ক্ষীণ,
সাদা শূন্যতায়
গদ্যলেখ : বিশাল প্রাচীর
অক্ষরের কালো ইট
ছোটো-বড়ো
নিবিড় যোজন
অবিরত চলাচল
ডান-বাঁয়ে
জোরকদম
যতিপাত
মাঝে মাঝে দ্রুতপাঠ
ধরেছে ফাটল
এখানেও
চুঁইয়ে নামছে ধারা
হরফের গা বেয়ে
বাঁকা নদী
এদিকেও
সাদা শূন্যতায়

সূচিকর্ম

পাড়ের সুতো পায়ের বুড়ো আঙুলে একসারি
বাঁধন দিয়ে চেরাই চলে কোমল দু-টি করে,
আলগা হয়ে যাচ্ছে, যত সুতোয় টান পড়ে—
শঙ্খলতা, পদ্ম সব রঙিন ফুলকারি।

পোড়েন-টানা জোড়ায় সুতো ছিল যা কাল শাড়ি—
ছুঁচের সাথি করলে তাকে চটের ফাঁকা ঘরে,
জীর্ণ থেকে শিল্প হয় খানিক অবসরে,
নিবিড় ফোঁড়ে নকশা ফুটে তখন মনোহারী।

আসন, কাঁথা, খঞ্চিপোশ তোরঙ্গের কাছে
জিম্মেদারি দেওয়ার পরে বছর কত যায়
হিসেব নেই; পত্র আর দলিল কিছু থাকে—
কালের ভাঁজে, শোষক কীট নাচার, তবু বাঁচে;
একেক দিন হঠাৎ করে দূরের স্মৃতি ছায়—
ওদের ছুঁলে ছোঁয়া কি হয় মা আর দিদিমাকে!

পতিত

পাথরবাগানে হাওয়া—
অফুরান,
পাতা ঝরে—
হলুদ
বাদামি
কালচে,
দীর্ঘ নীরবতা—
স্লেট আর মার্বেলের
হেলানো সবুজ বুকে।
ইতালির ম্যানুফ্যাকচার থেকে
এইখানে, গঙ্গাবাসী
মেশিনের কঙ্কাল—
লৌহমল— কবেকার গ্রিজ : নিপুণ মমতা
আজও চেরাইকলের কাঁধে,
স্ক্র্যাপের নিয়তিলতা বেড়ে যায়
গভীর বর্ষণে,
একসার সমাধির মাঝে।
হাওয়া বয়—
পাতা ঝরে—
হলুদ
বাদামি
কালচে,
এলিজি লেখার আগে
দীর্ঘ নীরবতা।

যাপন

নেই কেউ।
যেমন থাকার—
আছে আসবাব
ঘরদোর—
নেই কোনো
বিনিময়,
কথোপকথন।
তোমরা হে পরাপর,
ইথারে মিশেছ—
তাই সন্ধ্যেরাতে
ধূপ জ্বালি,
শূন্যে তার
বিধূম পাঠাই—
প্রতিদিন,
ঘ্রাণে হয়
জীবিতের
নির্জন
পরব।

রবে, নীরবে

হাওয়া এলেও স্বভাবজনিত,
নেই মাতন— কেবল সফরই,
রোজ সকাল দুপুর নিশীথে।

জেগে অনঙ্গ নীল প্রহরী,
পোড়ে চেতনক্রিয়ার সমিধও—
কাটা- ছেঁড়ায় কুটিল লিপিতে।

নেই কুশল কিছুই দ্বিরেফে,
দেখি তোমার চোখেও নিদাঘই—
ধ্রুব যখন তোমার দোটানা।

যদি সময় এমন বিরাগী,
তবু নয়ন আবার কী ভেবে
খোঁজে নিখিল স্রোতের মোহানা!

প্রিয়, শোণিত-স্নায়ুর শাসনে
নেই আগের ঝনক জোয়ারি,
ছিল সেসব কতই রপ্ত।

আজ বেকুব এমন দোহারি,
সবই হারায় বেতাল গাজনে—
ধ্বনি থেকেও, উধাও শব্দ!

পূর্বপ্রকাশিত

পূর্বপ্রকাশিত

সমাচার দর্পণ

১

কাপাসপণ্যের দেব, শুদ্ধতম প্রদীপের নিচে
ব'সে থাকা আমার নিয়তি? পুষ্পকোশিকার ফুল,
তুমি কা'র? সোনার রেকাব ছেড়ে ভঙ্গুর পিরিচে
তুমি কোন বন্দনার ফল? দেবতা : আপ্তের ভুল?

কাপাসপণ্যের দেব, তুমি খল প্রদীপের নিচে
আমাকে বসিয়ে রাখো; কূটশিখা, হোমাগ্নি আলোর
জাল, বেদগল্প, কথামালা, তব নৈতিকতা, কী যে
ভালো! আমি জানি, সুদ নাও তুমি যে-কৌম মালোর

তার প্রদীপের খাদ্য দিতে নিজস্ব চর্বির তেল
তন্তুসলিতায় মেখে ব্যবহৃত হয়। এই রোমাঞ্চের
স্বাদ তুমি পেয়েছো, দেবতা। শুধু, অখণ্ড আপেল
জানো তুমি; জালকাঠি বেঁধেছো কোমরে, এই ঢের।

২

অন্ধকার জলপথ; নৌকাযাত্রা, পারের অতীত
ব'লে মনে হয় তোমাকেও। শৈশব, কাঠের ঘোড়া,
কার্পেট, ঘুমন্ত পিতামহী— সবই চ'লে গেছো আজ
আরব্য রাত্রির দিকে; ছায়াপথ, প্রথম পাঠের
মতো এখন অস্পষ্ট তুমি; পাড়ের কাঁথায় তারা—
নক্সাফুল তুমিই তুলছো। ঈশ্বরের কথামালা
তুমি; এই জেনে, আমিও তোমার পাঠ— বর্ণস্বর
বুঝতে চেয়েছি; প্রিয়, অর্থভেদ কখনো করোনি।

অথচ সুসমাচার, আহ্নিক গতির মতো কেন
ফিরে আসো? কী কথা সুসমাচার? আরব জ্বলছে।
পারস্য-সাগর, তুমি পরিবাহী তেলের প্রণালী;
মসজিদের অর্ধচাঁদ, আজান, নক্ষত্র, ডলারের
বশংবদ উপসাগরের জল, দ্যাখো, তোমাদের
পারস্যনামায় কীট; ঐ মানমন্দির ধ্বংস হচ্ছে।

৩

দিন শেষ। ডিমিট্রিয়সের কথা ভাবি।
তার মুদ্রা এতোকাল ছবিতে দেখেছি।
নিশ্চয় কোথাও আছে; কাঁচের শোকেসে
কোনো, সংগ্রহশালায়। আমি এতোকাল
এই ভেবে যতোদূর চাই, অন্ধকারে
তার মুখ তখনি হারায়; কণিষ্কের
কবন্ধ মূর্তির কথা খুব মনে পড়ে।
আটলান্টিকের রাত কণিষ্ক বোঝে না।

পারস্য-উপসাগর থেকে ঝড় এলো,
দরায়ুস; ডিমিট্রিয়সের মুদ্রা, এই
চোখ অবিরাম মেগাস্থিনিসের দিকে
চেয়ে থাকে; তাঁর খেরোর খাতার লিপি—
বর্ণমালা পাঠ ক'রে ব্রাহ্মী অক্ষরের
দিকে যেতে চায়। হরিণ ও চর্যাপদ
মূরাকে জানে না। সারনাথ, শিলালেখ,
প্রপিতামহীর পায়ে প্রণাম শেখোনি?

৪

বেলজিয়াম, কাঁচের আয়নার মুখ,
ঘনিষ্ঠ পারদ, আমি তোমাদের যতো
ভালোবেসেছিলাম, তার চেয়ে অধিক
কোনো ভালোবাসা এখনো শিখিনি। থাকো
বেলজিয়াম, কাঁচের মধ্যে; কাঁচশব্দে
আমি, জেনো, তোমাকে পেয়েছি। প্রতিবিম্ব,
তোমার স্পর্শ পায় প্রিয় বেলজিয়াম;
এও কি যথেষ্ট নয়, ভঙ্গুরতা, প্রেম?

সেগুন কাঠের ফ্রেম, কাঁচের আত্মার
তুমি কতোটুকু জানো? শ্বেতপাথরের
ঘাম, ফিনিসীয় বণিকের নষ্ট চোখ,
জাহাজের রাত, আমাদের আবিষ্কার,
পারফ্যুম, কুঞ্জ, মেঘ, তোমাকে দিয়েছি।
বলো তবু, স্পর্শাতুর প্রেমিক পেলে না!

৫

মগধ-সাম্রাজ্য, রোম, নিরোর বেহালা;
অহো ব্যাবিলন— ঝুলন্ত বাগান, আমি
বাংলা কবিতার হাঁস উড়িয়ে দিলাম।
কন্সটানটিনোপোল ছেড়ে চ'লে আসা
রোমান প্রতিভা ঐ আরবে রাখলাম।
ততোদিন, তুমি হে ক্যানারি, ইতালির
ঘুম ভাঙিও না; মেদেচি পরিবারের
পিতা, ঘুমন্ত গর্ভের ভ্রূণ, সমুৎসুক
মেদেচি-মাতার ঘ্রাণ, গন্ধবহ হাওয়া,
আঙুর ক্ষেতের চাষী, লোকগাথা শোনো।
ততোদিন, তুমি হে গ্রামের কবি, প্রিয়,
ভেড়া চরাবে না? ডায়োনিসাসের বেদী
হাঁক দেয়— 'অঙ্গরাজ, বর্ষামেঘ এলো,
নাচবে না! যতোদিন ইতালি ঘুমোয়?'

৬

ইতালি : অ্যাকোর্ডিয়ান, স্বর্ণশস্যমেঘ।
ইতালি : বেয়াত্রিচে, দান্তের আবেগ।

ইতালি : ফ্যাসিস্ট, রণক্ষেত্র, মুসোলিনি।
ইতালি : ভার্জিল, পোপ, পেত্রার্কা, শেল্লিনি।

ইতালি : ফোয়ারা, ফুল, মিকালেঞ্জেলো।
ইতালি : ম্যাডোনা, গীর্জা— বৃন্দগান, চেলো।

ইতালি : পুরুষ, প্রেম, জুপিটার, নারী।
ইতালি : আঙুরক্ষেত, নরকসঞ্চারী।

ইতালি : পাহারাদার, ক্ষেতের বালক।
ইতালি : যীশুর ভোজ, ভেড়ার পালক।

ইতালি : আন্দোলন, পার্টি দো কম্যুনিস্তা।
ইতালি : সুসমাচার, সোডোম, রক্ষিতা।

ইতালি : গডফাদার, টিকিটের কিউ,
আফিম, চরস, নেশা; ইতালি, আদিউ।

৭

কিছুই দুরূহ নয়, লেক্সিকন, প্রেমিকের কাছে;
পাহাড়, সমুদ্র, নভ, ট্যাঙ্গোনাচ, মুখোশনির্মাণ,
পঞ্চাশ হাজার শব্দ বহনের সক্ষমতা, গান—
আগ্নেয় বীণায় গাওয়া, কিংবা, ঘুষি-মারা, কাঁচে।

তবুও দূরত্ব আনে, লেক্সিকন, তোমার বৈভব;
আত্মরতিপরায়ণ আমাদের চর্যা, পাঠমালা;
তুমি চাও পরিশ্রম, জেদী প্রেম, রুদ্রচোখ, জ্বালা,
আলস্যঅতীত এক জাগরণ, কুমারসম্ভব।

দুই মলাটের মাঝে নিজেকে লুকোও তুমি, আর
মানুষের পরম্পরা, ভাষাপ্রেম, ইতিহাসপ্রীতি,
স্থাবর সম্পত্তি, মোহ, কূটৈষণা, প্রতিযোগিতার
স্খলন, মুমুক্ষা, ভয়, গুপ্তরোগ, খাণ্ডবের স্মৃতি—
এসব লুকিয়ে রাখো, লেক্সিকন; তবুও তোমার
কিছুই দুরূহ নয়; চাই প্রেম, সহজ প্রকৃতি।

৮

পলাশীপ্রান্তর ছেড়ে চ'লে আসি, শতরঞ্জ, ও শীশমহল;
আমবন ছেড়ে আসি; গুলবাগ নেয় যদি ঘসেটি বেগম,
বলার কিছুই নেই; ঘোড়ার আড়াই চাল, কিস্তিমাৎ গজে,
এদিকে নৌকোর চোখ, মহামন্ত্রী বৃহস্পতি হাসে মিটিমিটি;
আল্লার দোওয়ায় ক্ষীর খেয়েছি অনেক, নিরন্ন থাকিনি ভাই,
রবার্ট ক্লাইভ, সমুদ্র পেরিয়ে তুমি আজ এসেছো যখন,
আমার আতিথ্য নাও, খাওদাও, ঢাকাই মস্লিন নিয়ে তোমাদের
হুইস্কি পাঠিও; জানো তো রিয়েল স্কচ, গথিক চ্যাপেল, আর
মিশনারি আমাদের কী ভীষণ প্রিয়! দোম আন্তোনিও যদি
প্রিয় বইখানা লিখে আমাদের উপহার না দিতেন, তবে,
তা কেনার মতো উচাটন প্রাণ, সখা, আমার ছিলো না, হায়!
আছুট হাতের ধুতি, মোটা চাল, বালবাচ্চা পেয়েছি যখন,
চাঁড়ালের হাত দিয়ে দোম আন্তোনিওকথা পোড়ানো হ'লো না।
আমার এ-পাপ, মাগো, ক্ষমা ক'রো, ব্রহ্মময়ি, তোমাকে প্রণাম।

৯

অচির ফাল্গুন, আমাদের করুণ প্রার্থনা তুমি
শুনবে না আর? গহ্বর, আঁধার, চিতা, গোলাপের
কেন্দ্রে আছো যেসব বিস্ময়, তোমরা কি কোনোদিন
অনুশোচনার মুখ ভুলেও দেখোনি? দিন যায়।

হে পাথর, বামনের উত্থিত পায়ের নিচে
প'ড়ে আছো, সেই কবেকার নিয়তি মেনেই আজ
দেখা হ'লো, প্রেতশিলা; হেমন্ত এসেছে।

গণ্ডূষ, এখন আলিঙ্গন, ওষ্ঠ নাও; প্রিয় মেঘ,
আঁধার ক'রো না এই বালক কবির দিনরাত;
তার প্রেম সর্পদেবতার মতো বন্দনায় বসে—

সমুদ্রবন্দনা তার; নীলবীর, সমুদ্র বেঁধেছো?
অতীত, সুসমাচার, যূথচারী মেঘের মিছিল,
তোমরা কৃপণ নও; একথা জেনেই বলি— গোলাপের
অস্ফুট কুঁড়ির মতো সবকিছু গোপন ক'রো না।

অক্ষর

তুমিও অস্পষ্ট হও, চিঠি লেখো ইতস্তত করে!
আমি সর্পনিদ্রা ছেড়ে জেগে উঠি, খোলস ছাড়াই;
তোমার চিঠির সব যতিচিহ্ন এবং অক্ষরে
আমার তন্দ্রায় ভিতু মেঘ জমে, হাওয়া সাঁই সাঁই...

এভাবে ঘুমের থেকে জেগে উঠে পুনর্বার ঘুমে
আমার গন্তব্য যেন ঘোর বর্ণে ফিরে যেতে চায়,
এভাবে মূর্ছার মত আচ্ছন্নের নিবিড় মৌসুমে
তোমার সঙ্গের তীব্র উপেক্ষায় আছি নির্দ্বিধায়।

ও গোপন ইতস্তত, বিরাগের ভাষাও শেখোনি!
ভাষামাতৃকার স্পর্শে কেঁপে ওঠে মান-অভিমান,
ধূসর তরঙ্গে শব্দ শঙ্খমুদ্রা এবং লেখনী
তারই অনুবর্তে পায় সমুদ্রের আত্মার সম্মান।
দীর্ঘসূত্রী দুজনেই, কেউ নয় বিশেষ উত্তাল,
সম্ভোগের দিবাঘুমে কেউ আর হব না মাতাল।

ক্ষেত্রজ

কী বিষণ্ণ কৃষিদেশ! এখনো ডোঙায়
জল, ওঠো; পাম্পসেট : মহার্ঘ দেবতা,
ধর্মঠাকুরানী টুসু আর সিং বোঙায়
তোমায় কুলীন করে, এমন সমঝোতা।

চাষখেতে গর্জমান তুমি হে ট্রাক্টর,
অর্ধেক ভারত তুমি, সবল পুরুষ;
এই মৎস্যদেশ নয় তেমন কট্টর,
যে তোমায় দেখে ভাববে— এসেছে কলুষ!

আনো ভূমিখণ্ডে আরো তোমার জৌলুস;
লাঙল— সে রুগ্ন স্বামী; আলপথ, জেদের
বশবর্তী হয়ে আর তোমার কুরুশ
কাঁটা দিয়ে বুনো না হে নীল দিগন্তের
কন্যার বিবাহশাড়ি; দাও, উলু দাও,
নতুন জামাই এল, কী চাল চড়াও?

চিয়ার্স

মোটর বাইক আর হেলমেটের সভ্যতায় আছি।
ঊরুর সাইজ দেখে মনে হয় ধূর্ত আমানত
বকেয়া খরচ নিয়ে মহব্বতে খেলে কানামাছি;
ও ব্রাদার, পার্ক ভিউ কাফে থেকে হটাও শরবত।

মফস্বলে, গ্রীষ্মদিন, নিয়ে এসো বিয়ারের পাব,
সরকার দরাজ হলে প্রবঞ্চনে লগ্নি করো পুঁজি,
দরদ খাটাও কিছু, বেহুদা না হোক এ-ইনসাফ,
কাঁহাতক গরিবীর নাঙ্গা হাত আর অন্ধ গলিঘুঁজি!

ইন্দ-সুজুকির দেশে আমরা তো প্রতিক্রিয়াশীল,
পাওয়ার পাওয়ার ওগো ডিগিডিম সমাজতান্ত্রিক,
আইয়া আইয়া হো হো এই দ্যাখো হজমের কিল
গোঁত্তা মেরে উঠে এল, বমি পায়, কী করব যান্ত্রিক?
চার্জ দাও, ও ব্রাদার, থেমে যাচ্ছি— ব্যাটারি ডাউন।
কবে যে পালক রেখে উড়ে গেছ, লো ফ্যানি ব্রাউন!

মায়াবন্দর

যখন দুরন্ত এসে চাপ দেয়, সেই আগন্তুক—
যার ওষ্ঠপুটে লেগে আছে মৃত মকর, জাহাজ,
যার হাঁ-এর গহ্বরে ডোবে দেশ, রণতরীভুক
সেই আগন্তুকই বলে যেন মায়াবন্দরের কাজ

শেষ হতে পারে, যদি তুলে নিস বিপুল অ্যাঙ্কার;
যদি সর্বস্বের সঙ্গে তোর আর বিবাহ না হয়,
যদি মোমের আঠায় কান বন্ধ করে আর
গান না শুনিস, তবে চলে আয়, দ্যাখ স্রোতময়

এ-বুকের অন্তরালে রাখা আছে আরেক পৃথিবী,
এখানেই পাবি তুই দ্বীপময় সবুজ উদ্ভিদ,
প্রবালপ্রাচীর ছুঁয়ে রত্নকোষ, আর দেখে নিবি
মৃত আগ্নেয়গিরির অন্ধকারে বিলুপ্ত সম্বিৎ।
আমি কীভাবে বোঝাই তাকে এ-মায়াবন্দর
প্রগাঢ় শেকল দিয়ে বলেছিল— বদর বদর!

প্রতিবিম্ব

নতুন আয়না চাই; দাঁতভাঙা চিরুনিটা বদলালে হত!
বদলালে হত আরো অনেক কিছুই। যেমন, ঘড়ির কাঁচ,
পায়ের চটিও; কিন্তু এত বদলের নিজস্ব চাহিদা আজ
উপায় না পেয়ে কিছু সুনীচ ছায়ার মাঝে ছায়ায় সংযত।

বাবাছায়া, আমিছায়া, আমাদের সবার সমস্ত ছায়া ধরে
ভাষার অদৃশ্য ছায়া কবিতার অন্তর্গত হলে ভালো থাকে কেউ;
কেননা সমুদ্র আসে এইভাবে, ঝাঁক ঝাঁক সিন্ধুচাপ— ঢেউ,
এভাবে আবর্ত— জলনাভিকূপ— মৃত নক্ষত্রের ছায়াপথ ওরে,

বয়েস বাড়ার সঙ্গে কিছু সমতল ভেঙে উচ্চাবচ হয়।
দেখা যায়— পারদ চটেছে, ফ্রেমে পালিশের জেল্লা চলে গেলে
যা থাকে, তা মমতার অতিরিক্ত দ্যুতি কিছু, সম্মিলিত ভার,
ধুলো মোছামুছি আর মাঝেমাঝে অনর্থক ঝাড়পোঁছ তার।
তখন শব্দের নীতি : সহজ সাধো রে মন, সহজে মৃন্ময়
তোমার রহস্যময় আত্মারাম, সে বেচারি যেন এলেবেলে!

আজনবি আর হাসিনা

১

উতল হয়েছ মন,
তারই গান শুনবার সময় এসেছে ব'লে
'সাইরেন সাইরেন' বাতাস বলছে, আর
মনোবেড়ি শক্ত হয়ে চাপ দিচ্ছে অসম্ভব, হে উড়াল,
ছিঁড়ে ফেলতে চেয়ে আমি বন্ধন আরো বেশি
খিটকেল ফাঁসেই তবু ছটফট করছি
ওগো সঙ্গীসব— নাবিকেরা,
মোমের আঠায় কান বন্ধ ক'রে যারা আজ পার হচ্ছ অন্তরীপ,
ঝটিকামোহিনী তার সুদূর ট্রেমোলো নিয়ে ঝাপটাল ডানা ওই—
চোখের অগম্য সেই নিসর্গ যেখানে বসে
মকরবীণার তারে হাত রেখে— করাঙ্গুল ঢেউয়ের ডানায়,
আমি সেইখানে, সাইরেন,
অতল জলের নীচে শুয়ে থাকা ভ্রষ্টতরী
ঝিনুক প্রবাল আর শাদ্বল-আকীর্ণ মাছ— মাছেদের চলাফেরা
নষ্ট চোখ নাবিকের হাড়ে একটু ছুঁয়ে যাওয়া সেই স্বর :
শুনে যাই তোমার ওই গান।
মকরবীণা কি তবে তাঁতকল, আজনবি!
টানাপোড়েনের থেকে সমুদ্রবসন হাতে ফিরবে যে
হাসিনার কাছে?

৭

চাঁদের থুথুতে কত অভিশাপ ছিল ব'লে
কী আর বোঝাবি তুই
ক্ষমাহীন চন্দ্রাঘাতে কাজলা দিদির মতো অরুন্ধতী কেন যায়
সাতটি তারার ওই প্রশ্নচিহ্ন ছুঁয়ে!
অফিস ফেরার পথে কেন সে ফেরেনি আর
লোকাল ট্রেনের ওই বাদুড়ঝোলায় ঝুলে?
লালবাজার হেস্টিংস কড়েয়া বউবাজার কসবা সোদপুর থেকে
কল্যাণী ফেরৎ সব আঁকাবাঁকা কাটাকাটা
হ্যাপাজার্ড কথা এসে
হাসিনা, যখন তোর মশারির চারপাশে বিজবিজ করে,
তখনো চন্দ্রকণা থিকথিকে হয়ে দূর সানটিঙে— লোকোশেড—
স্ক্র্যাপের জড়িমা ঠেলে তিমির কান্নার মতো
শব্দ নিয়ে ছুঁয়ে যায়
নিচাক্কা রাতের এই ভৌতিক পাড়াটাকে।
একটা স্বপ্ন এসে আরেকটা স্বপ্নের ঘাড় কামড়ে ধরে।

৯

পুরুষত্ব কাকে বলে?
এই প্রশ্নে হাসিনার,
মৃদু স্বরে বলি : দ্যাখো আমারো প্রশ্ন এই!
দু-দুটি পুরুষ, ধরো, যে-যার মতোই তারা পুরুষালি,
অথচ এদের মাঝে একজনই
তোমার পছন্দ হলে
পুরুষত্ব তখন আর একক স্বয়ম্ভু নয়—
নয় সে তো খুব কিছু মুখাপেক্ষাহীন,
বরং এতেই কিছু বোঝা যায়
পছন্দের কাঁটা একটু এদিক হলেই
ওদিকটি হাহাকার,
এমনকী শেষমেশ ডুয়েল-মাস্তানি অব্দি
গড়াতেই পারে।
রক্তপাতে পুরুষের গভীর রিরংসাটুকু
যেহেতু প্রতীকী, আর
রজস্বল দায়ভাগ পুরুষের নেই,
পুরুষত্ব সবটুকু শারীরিক নয়,
কিছুটা চাপানো আর কিছুটা প্রাকৃত,
তাছাড়া ঈর্ষা আছে—
যৌন ঈর্ষা থেকে যৌন বিদ্বেষ সবই
একে একে কাতারে কাতারে আরো মিছিলের মুখ;
চুড়ি, কী পায়জোর-বেড়ি, ঘুঙুর, চুটকি আর
পুরুষ কর্মকার, হাপর, ধাতুর ছাঁচ, ব্লো-পাইপ,
সূক্ষ্ম বাটালি আর হাতুড়ির ঠুকঠাক—
এসবে, এখন বলো,
প্রমীলা কর্মকার কোথায় রয়েছে?

বেড়া বেঁধেছেন রামপ্রসাদ

বেড়া বেঁধেছেন রামপ্রসাদ সজীব লতা দিয়ে।
মেঘের পরে মেঘ যেভাবে তন্ময়তা নিয়ে
মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে, জলের দিক চায়,
ভাতের হাঁড়ি যেইভাবে রোজ মনস্কতা পায়
রান্নাঘরে কিংবা কোনো ফুটপাথে রাত্তিরে—
গৃহস্থী, বা সাতভাতারীর বয়নমুদ্রা ঘিরে।

আমরা বাঁধি কথার কথা বেচাল অনুভবে।
জট বেঁধে যায় তাতেই বেশি, জট খুলতে হবে—
ভেবেও তবু আড়াই প্যাঁচে জব্দ হয়ে যাই
এবং নিঃশব্দচারী তর্জনী যা পাই,
বুঝতে পারি রামপ্রসাদও এসব কিছু নিয়েই
বেড়া বেঁধেছেন অসম্ভব, সজীব লতা দিয়ে।

তার মা-কে

মা, এই রাত্রির স্বপ্নের বিষাদ যাকে ছুঁয়েছিল, সে তোমার কেউ নয়; যে বমন করেছে শুধু অন্ধকার, অন্ধকারে একা-একা যে বমন করেছে, তার স্বপ্নে কোনো সমুদ্র ছিল না। এপ্রিলের সমুদ্র তুমি দেখেছিলে? শাদা ঢেউ?

রেকলেস! আমরা ভাইবোন সকলে ছড়িয়ে পড়েছিলাম, উড়ো পাতাদের মতো, ছেঁড়া চিঠির মতো হয়তো বা! কী আশ্চর্য তোমার চিঠিগুলোও ছড়িয়ে পড়ল। দারুণ হাতের লেখা ছিল তোমার— কী ভাবতে তুমি? কোনো জটিল ভাবনা ছিল, যা অপ্রকাশ্য? এমনকী, যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা যায়, তার কাছেও? এরকমই হয়, এরকমই— উড়ো পাতা, শান্ত ওড়াউড়ি, ভাঙা টিন, শূন্য বোতল আর অবশেষে ভেঙে ফেলা।

স্ট্র্যাংলিং! যে যার কাজের চাপে নুয়ে পড়ছি ক্রমশই, যে যার টাইয়ের ফাঁস আটকে ফেলছে খুব জোরে, উফ! আর একটু হলেই সব খতম হয়ে যেত। ভাগ্যে তোমার আশীর্বাদ ছিল! তুমিও এভাবেই একদিন ফাঁস আঁটতে চেয়েছ নিজের গলায়, পারোনি। জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে গুঁজে দিতে চেয়েছ শরীর, পারোনি। এমনকী হাতের শিরা কাটতে গিয়েও ভেবেছ, অত রক্ত যদি আরেকবার ঢেলে দিতে পারতে কোনো মাংসপুতুলের দেহে! অথচ, ততদিনে সব রক্ত— ঋতুধারা, বাষ্প হয়ে, শাদা মেঘ হয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। তুমি নিষ্পলক, চুপচাপ শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েছিলে— যেন শূন্যতা কখনো দেখোনি, যেন এই প্রথম তুমি একলা হচ্ছ, যেন এই প্রথম তুমি নিজের কথা ভাবতে শিখলে কিশোরীর মতো।

দু-পায়ের ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দু-পা ধরে কে ফাঁক করে দিচ্ছ? কে? আঃ রক্ত দলা-দলা! গর্ভগর্ত ফাঁক করে কে বেরিয়ে আসছ? কে? রক্ত দলা-দলা। রক্তনদীধারা।

এইমাত্র যাকে শোয়ানো হল ছোট্টো খাটে, এইমাত্র যার হাতে বেঁধে দেওয়া হল প্লাস্টিকের চাকতি, কিছুক্ষণ আগেই যাকে ধোয়ানো হচ্ছিল— যেভাবে জল এসে ধুয়ে দেয় নুড়িপাথর, অনেকটা আমার মতোই যার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই পাশ ফিরে শোবার, এমনকী যার মাথার ফাঁকে কাঁথা গুঁজে দিতেও সেই দেবকন্যাদের প্রয়োজন, যারা এই ঘরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দে, অথচ কী তৎপর, যেন কিছু সৃষ্টি করতে চায়, সৃষ্টি-মুহূর্তের নিঃশব্দ তৎপরতা নিয়ে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের টুপিগুলো কী নিঃশব্দে উড়ছে, যেন শঙ্খচিল, যেন এই মুহূর্তে পাখসাট দিল হাওয়ায়, যেন এই মুহূর্তেই একবার ছুঁয়ে গেল সমুদ্রের ঢেউ— ঢেউগুলো— আমাদের, কেননা এতক্ষণে আমরাও হয়ে পড়েছি এই ঘরের এই সমুদ্রের এক-একজন অধিবাসী, এক-একটি ঢেউ। আর সেই এতটুকু মাংসপুতুল, যে ওই গর্ভগর্ত ফুঁড়ে অনেক কান্নার পর ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকেও সেই রাত্রির স্বপ্নের বিষাদ এসে ছুঁয়ে যাবে, আমি তখন কেউ নই, মৃত শিকড়ের মতো উড়ো পাতাদের মতো, এরকমই— শান্ত ওড়াউড়ি ছাড়া কিছু নয়... এরকমই হয় : ভাঙা টিন, শূন্য বোতল আর অবশেষে ভেঙে ফেলা।

সুতোর গান

২

সুতোয় মাঞ্জার মতো তুমি যে রয়েছ, আমি
অনেক তালাশ করে এই সার বুঝি, প্রিয়।
তোমার নামের আঠা তোমারই নামের গুণে
রঙিন হয়েছে, তাই আমার সুতোয় তুমি
নামরূপ ধরে আজ প্রকট হয়েছ ব'লে
আমিও লাটাই হাতে তোমায় গুটিয়ে রাখি,
কিংবা ছেড়ে দিতে পারি আরো ঊর্ধ্বে ঘুড়ি তুলে।
স্পিনিং স্পিনিং— ভ্রমি— মাকুতন্তু বনবন—
সুতোর আবর্তে সুতো— খেয়া-খেয়া পারাপার...
নদীর এপার কহে মায়াপুর ছাড়ি যাও,
ওই পারে নবদ্বীপ— যাও যদি, সুয্যি ডোবে,
শোনরত্ন ডুবে যায়, কে যায় কৃষ্ণনগর?
নৌকা হেঁকে চলে গেল। মরচরাচর থেকে
কোথায়, কুমার, তুমি কোথা যাবে পান্নালাল!
সুতো এ-শরীর, ওগো, নামরূপ মাঞ্জা নিয়ে
সুতোর আবর্তে সুতো— খেয়া-খেয়া পারাপার।

৯

চোখ দুটি বুজে তুই ভাবিস পুরুষে পেলি;
ও মেয়ে, রতির মর্মে ঠগিনী কি চেনে মন!
পুরুষও চেনে না, তোর সতীনের ঘরে শুয়ে
ভাবে সে তোকেই পেল, পুরুষও তময় তম।
এই এক পাশাখেলা— মায়াকানী ফেলে দান।
পাশার ভেতরে সীসা চূর্ণ ক'রে দিয়ে সেই
মায়াশকুনির হাসি— প্রতিহিংসা— নির্বাসন,
বনপর্ব শুরু হয়। সুকুমার হত্যাগুলি
সাবলীল হয়ে এলে ঘাতক পুরুষ আর
ঘাতক নারীর মর্ম একই রক্তে করে স্নান—
বিবাহের এই স্নান— এই রক্ত-বিবাহের
ঢোলক-চাঁটির গানে জেগে ওঠে কোলাহল,
উলু-শঙ্খ-বসুধারা— দেয়ালে রক্তের ধারা।
কোথা কন্যারত্ন যাও বাপে নিঃস্ব করি, মেয়ে?
নিঃস্ব মায়ে নিচুমুখ। কোথায় স্বামীর বাড়ি?
ধর্মমেঘ বলে হেঁকে— চরশিবশম্ভুপুর।

১১

এও এক রতি, জেনো। তোমার বিরহ যদি
শব্দরসে পেয়ে আমি শব্দে ঢালি দিবানিশি।
শব্দে চিক ফেলে যদি শব্দে জ্বালি বাতিদান,
সেও এক কুহু হয়, তখন বসন্ত ঋতু।
আয়ুষ্মান হয় শব্দ, বর্ণ বসে ডালে ডালে,
স্বর— মায়া-মর্মরের, চিহ্ন— সে তো অবসর।
পান্নারং শব্দ পেলে, লাল রঙে মাত্রা তার
নিষ্পাপের পরে যেন অভিজ্ঞতা গান হয়।
সহজ-সুরতি হলে শব্দে চাঁদ— সুধাকর,
নাহলে দাহন সবই, সূর্য দেয় অগ্নিরস—
শব্দমুখে অগ্নি তাই, শব্দ করে উদ্গীরণ,
এও এক অভিজ্ঞতা, বিরহ তখন, প্রিয়।
শব্দে ছিল বাগ্‌দান, শব্দে রতি হল তাই;
শব্দশুঁড়ি দেয় মদ, মন-মাতাল চরাচর।

১৪

জেনো তাকে সুসময়, সু-প্রভাত ব'লে জেনো—
ঘুমন্ত মানুষ যদি ঘুম ভেঙে পাশে দেখো
এবং নিঃশ্বাসে তার তোমারই কাঁধের 'পরে
পালক-বীজন ব'লে মনে হয় কোনোদিন!
বিবাহ এমনই— এর বেশি কিংবা কম নয়,
যে-যাই বলুক, কোনো মকরন্দ নয়, তবু
মায়াবী শরীর দিয়ে বিছানা উজ্জ্বল হলে
সেও এক তন্ময়তা। প্রগাঢ় আশ্লেষ আর
দংশনের পরে একটি চুম্বনের সার্থকতা :
আসলে বন্ধনে থাকা পরস্পর মন নিয়ে—
অণিমা লঘিমা কোনো প্রাপ্তি দিয়ে কথা নয়,
সহজ বন্ধন এক। তবুও যে কুঁড়ি আর
কীটের সম্পর্কে এত কথা হয়, গান হয়,
আকাশবিদারী সব তর্কে ওঠে এত ঝড়,
কুঁড়ির গভীরে নেমে সেও এক বিচলন—
কীটের ভ্রমণ যেন, পিঁপড়ের চলাফেরা।
কুঁড়ির পরতে কোনো শ্রীমণ্ডল আছে কি না,
এই এক প্রশ্ন নিয়ে অবিরল যাতায়াত।

অক্ষর ও আহিতাগ্নি

(শিল্পী অলোক সোমকে)

শরতের প্রসন্নতা পায়নি যে-শব্দগুলি,
এখন বেগানা হয়ে কোনখানে যাবে আর?
উদ্বাস্তু শিবির থেকে কলোনি হলেও তার
ঘিঞ্জি পথে মাটি রাখে আপন স্বত্বের ধূলি।

কেবল শ্রমিক জানে নিভৃতে কী অবকাশ
গড়ে ওঠে তক্ষণের নিবিড় মুহূর্তে সব,
অথচ ক্রেতার আছে স্বতন্ত্র যে অনুভব—
চাহিদা-জোগানে মিল না হলেই পরবাস।

টুং-শব্দে আঙুলের ভূমিকার অনুরূপ
ধাতবের চিরধর্ম ধ্বনি-প্রজননে তার,
নিষ্প্রাণ দেয়ালে তবু ছবি এঁকে যায় মন;

নির্গুণ অক্ষর থেকে উঠে এলে শব্দমুখ,
মুদ্রণের আগে আত্মা পঞ্চানন কর্মকার—
চুল্লির তাপের মান জানতে চায় সারাক্ষণ।

অয়নপথে শ্রীখ্রিস্টকীর্তন

বুড়ির মাথার সেই পাকাচুল রং ক'রে
ঘণ্টা হাতে ফেরিওলা বছর দশের ছেলে।
আকাশবাণীর গান জিংগল্‌ জিংগল্‌ বেল-এ
নিয়ে আসে বড়দিন আকাশ মেঘলা ক'রে।

আপাত বর্তুল, মিষ্টি পাপড়ি তুমি মুখে ভ'রে
গলিয়ে ফেলেছ বেশ, যখন চিবোতে গেলে—
লতিয়ে উঠল গান জিংগল্‌ অ্যাল দ্য বেল-এ;
ক্ষীণ ধ্বনি, ঘণ্টা নিয়ে সে-ছেলে পাড়ায় ঘোরে।

তারই শব্দে মৌন থেকে লিপির কুশল জান,
খোঁজ নাও প্রস্বরের দেশী ও বিদেশী মুখ;
গান বলে— ভালোবাসতে পাঠ নেওয়া সমীচীন।

অথচ তোমার কাছে সাক্ষরের অভিমানও
বালকের একাফেরি— নিরক্ষর, আত্মভুক;
ঋতুবৃত্তে পাকে চুল, আসে যায় বড়দিন।

এই কবিতাগুলি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
এখানে আগের বানানরীতিই বজায় রইল। — সম্পাদক

আলোচনা

মহাজাগতিক ঋণে আবদ্ধ কবি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জিত সিংহ

অক্ষরে অক্ষরে যুক্ত হয়ে শব্দ তৈরি হয়। শব্দে শব্দে যুক্ত হয়ে বাক্য, কবিতার ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তি। এই শব্দাঙ্কিত পঙ্‌ক্তিকে ধরে রাখতে হয় একটি দৃঢ় সুসংহত কাঠামোর ভিতর। কবিতার পরিভাষায় বলি প্রকরণ। পীনপয়োধরকে বন্ধনীকৃত করা হচ্ছে প্রকরণের কাজ। স্তনবন্ধনীর মতোই কবিতার শব্দাবলি আবেগে দু-কূল প্লাবিত যাতে না করতে পারে, তার জন্য দার্ঢ্য প্রকরণের আবশ্যক। এই প্রকরণ যে-কবির উপলব্ধির বাহন, তিনি স্বভাবতই সংযতবাক্। বাংলা কবিতায় ছন্দের মৌলস্বরূপ মাত্রাজ্ঞানে। একমাত্রারও হেরফের বাংলা ছন্দে অচল।

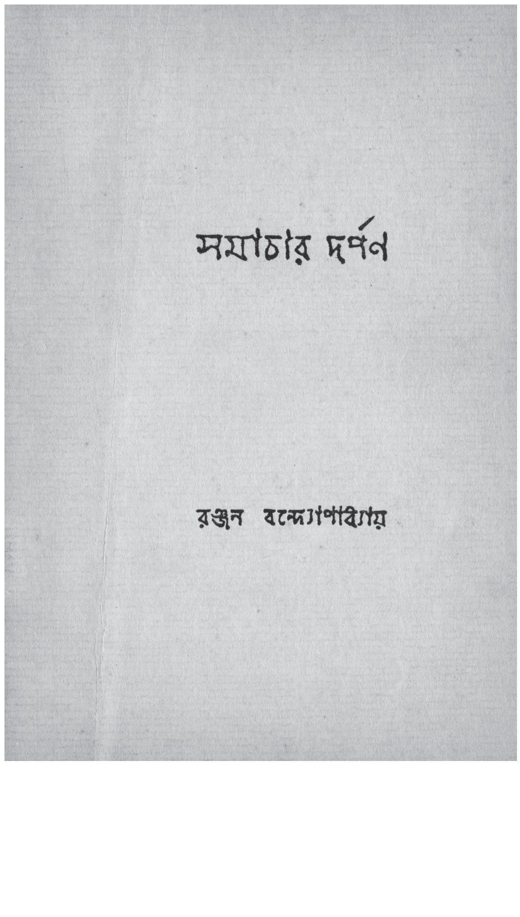
সেদিক থেকে বিচার করলে সনেট একটি আদর্শ প্রকরণ। কিন্তু সনেট প্রথাসিদ্ধ কাব্যবন্ধনী। যে-কবি নিজের উপলব্ধির সমানুপাতিক ভাষা ও প্রকরণ অন্বেষণ করেন, যা সৎ কবি মাত্রেরই আদ্যকৃত্য, তাঁর কাছে সনেটের প্রকরণ কতটা কার্যকরী তা ভাববার বিষয়। বহু বিখ্যাত বিদেশি কবি সনেট লিখেছেন, সনেট-প্রকরণের উদ্ভাবনকর্তা তাঁরাই। বাংলাতেও মধুসূদন দত্ত, প্রমথ চৌধুরীর মতো প্রাতঃস্মরণীয়েরা তাঁদের ভাবের অবলম্বন হিসেবে সনেটকে নির্দিষ্ট করেছেন। মনে রাখতে হবে, গঠনপ্রণালীতে কারো সনেটই কারোর মতন নয়। বিভিন্ন কবির কলমে সনেট কোনো স্থির নির্দিষ্ট আকারে দাঁড়িয়ে নেই। পেত্রার্ক বা দান্তের 'ভিটা ন্যুভা'-র সনেট-গঠনের সঙ্গে শেক্সপিয়রের সনেট-গঠনে পার্থক্য আছে। মিল শুধু মাত্রাজ্ঞানে। সংহত বন্ধনে, স্তবকবিন্যাসেও প্রত্যেকে একপথের পথিক নয়।

তবে কেন কবি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সনেটকে তাঁর উপলব্ধি বা প্রসঙ্গের উপযুক্ত বাহনরূপে নির্ধারণ করলেন?

রঞ্জনের জন্ম ১৯৬১ সালে। তাঁর বাসস্থান উত্তরপাড়া। তাঁর প্রথম কাব্যপুস্তিকার প্রকাশকাল ১৯৮৭ সাল। তিনি আমার সন্তানের বয়সি। অবশ্যই স্বীকার করি, কবিতা রচনার প্রস্তুতিকর্মে তিনি আমার কাছে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী কবিপুরুষ। এই কথার যথার্থতা বুঝবেন যাঁরা কবীর ও তুকারাম তথা মধ্যযুগীয় সন্তকবিদের উপর ওঁর গবেষণামূলক কাজ ও মূলানুগ অনুবাদ পড়েছেন।

রঞ্জনের নিজস্ব কবিতার পশ্চাৎপট এই মধ্যযুগীয় কবিবর্গ। হিন্দি ও মারাঠি ভাষা থেকে কবীর ও তুকারামের অনুবাদ করতে গিয়ে এই কবি একটি মহৎ শিক্ষালাভ করেছেন। রঞ্জন শব্দপ্রয়োগে সচেতন, তাঁর রচনা কোনোভাবেই আবেগভাসিত নয়। তাই সনেট প্রকরণই এই কবির কাছে এতটা আবশ্যক মনে হয়েছে।

কবীরের 'বীজক'-এর রঞ্জনকৃত অনুবাদ পড়লে বোঝা যায় 'শব্দ' কবিতায় নানা ব্যঞ্জনাবাহী। প্রতিটি শব্দ পরবর্তী শব্দের সঙ্গে একটা সংযোজক অব্যয়ের মতো যুক্ত হয়ে আছে। সন্তকবি তুকারাম বলছেন, শব্দ পছন্দমতো হচ্ছে না বলে বার বার পালটিয়েও, কবি পাঠকের কাছে যে-ভাবসংকেত পাঠাতে চাইছেন, তা তিনি যথার্থভাবে পেরে উঠতে পারছেন না। একটি ঐশী অসন্তোষ।



সমাচার দর্পণ, পর্ণশবরী, ১৯৮৭

কবীরের 'বীজক' অনুবাদ শেষে 'শব্দ-সংকেত' পরিচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রঞ্জনের গবেষণাধর্মী মননেরও পরিচায়ক। 'শব্দ' হচ্ছে চৈতন্যের স্পন্দনাবস্থা। অর্থাৎ সৃষ্টি-কল্পনা, যার ভিতরে শব্দ এবং অর্থ এক হয়ে রয়েছে। রঞ্জনের মধ্যবর্তিতায় এও জানতে পারছি, সন্তকবিবর্গ একে 'পরশব্দ', 'পরমশব্দ' বা 'সারশব্দ' বলছেন।

এই প্রেক্ষিতকে মনে রেখে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা যদি পড়ি, তবে বুঝব নিজস্ব প্রকরণ আবিষ্কার না করে প্রথাসিদ্ধ সনেট প্রকরণকে কেন এই কবি তাঁর উপলব্ধির উপযুক্ত বাহন হিসেবে গ্রহণ করলেন। সংযত ও সংহত এই কবির ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন সনেট ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সমাচার দর্পণ* (১৯৮৭) ২০ পৃষ্ঠার একটি কাব্যপুস্তিকা। ৮+৬ স্তবকে বিভক্ত। মাত্রাগতভাবে কোথাও তা ৮+৬, কোথাও-বা ৮+১০-এ বিভক্ত। কোথাও যাতে আবেগোচ্ছ্বাসে শব্দদূষণ না ঘটে, সেদিকে কবি অতিশয় সতর্ক।

সমাচার দর্পণ-এর ভূমিকাকল্প সনেটটি ৮+৬ মাত্রায় বিভাজিত। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক :

> তখনই জানবে কেন ক্রোড়পত্র নেই,
> গ্রন্থনামে কেন এতো ভ্রান্তি বারবার,
> কেন শব্দ শাখা নয়, যায় পল্লবেই,
> আমারও শরীর কেন ক্ষুব্ধ পারাবার।

রঞ্জনের কবিতা পড়ে প্রথমেই বিস্মিত হয়েছি, 'শব্দ' শব্দটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ করে। কবীর ও তুকারামের কবিতার অনুবাদ পড়ে বুঝেছি, রঞ্জন-ব্যবহৃত 'শব্দ' আভিধানিক অর্থবাহী নয়, তা নানাত্বব্যঞ্জনাবাহী। লক্ষ করেছি, কবীর ও তুকারাম তাঁদের নিজস্ব রচনা সম্পর্কে একটি ঐশী অতৃপ্তির যন্ত্রণা প্রকাশ করে গেছেন। অনুরূপ অথচ প্রাতিস্বিক পদ্ধতিতে উপরের উদ্ধৃত চারটি পঙ্ক্তির ভিতরে রঞ্জনের কবিসত্তার নিজের বিরুদ্ধেই একটা অভিযোগের স্বর শুনতে পাই। 'কেন শব্দ শাখা নয়, যায় পল্লবেই'। আমার মনে হয়েছে, একটি ব্যাপারে এই কবি সতর্ক, তার কবিতা পল্লবগ্রাহিতার দিকে যেন না যায়। নিজের প্রতি অভিযোগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবির নিজের প্রতি প্রশ্ন— 'আমারও শরীর কেন ক্ষুব্ধ পারাবার'। রঞ্জনের অন্তরাত্মায় ওই ঐশী অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তি কবিতাটি কেন কবিতা হয়ে উঠছে না, সেইজন্য নয়। তাঁর কবিতা চৈতন্যের জগৎ-কে কেন স্পর্শ করতে পারছে না, সেইজন্য।

সন্তকবিদের কাছে কবিতার ছন্দ, ভাষা, প্রকরণ তাঁদের উচ্চতর ভাবপ্রকাশের বাহনমাত্র। রঞ্জনের কাছেও কবিতাই কবিতার মাধ্যম নয়, কবিতা উচ্চতম ভাববহনের মাধ্যম। এবং এই মাধ্যম যথার্থভাবে তার কাজ করতে পারছে কি না, এই ভাবনায় কবি নির্দ্বন্দ্ব হতে পারছেন না। কোথাও যেন একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

রঞ্জনের চারটি কবিতার বই একত্রে পড়লে বোঝা যায়, কবিতার প্রাকরণিক বন্ধনকে ক্রমশ তিনি দৃঢ়তর করে চলেছেন। শুধুমাত্র শব্দের অন্তর্নিহিত ওই চৈতন্যস্পন্দনকে স্পর্শ করার জন্য।

কবীর ও তুকারামের মতো সাধারণ জীবনযাত্রা-চিত্রিত শব্দ সংগ্রহ করেছেন রঞ্জন। এবং নিয়ে যেতে চেয়েছেন ওই শব্দমালাকে অতিমাত্রিক অবস্থানে। 'তত্ত্বমসি'-র ধ্যানস্থ অবস্থা স্মরণে রেখেই হয়তো সেদিন যুবক কবি বলেছেন :

> আমি ধনু, আমি ছিলা— এই কথা জেনে,
> জাগাও আঙুলে, ব্যাধ, ছিলার টঙ্কার।

ফলত রঞ্জনের কবিতা চিত্রকল্পপ্রধান। কারণ ধ্রুপদী ঢঙে কবিতা ঘন ও নিবিড়। একটিও বাড়তি শব্দ নেই। শব্দের মূল্য ও স্বরূপকে স্বর্ণকারদের মতো ভালো করে যাচাই করে রঞ্জনের কাব্যপঙ্ক্তি নির্মিত হয়েছে। এই জাতের কবিদের পূর্বসূরি যদি ওই সন্তকবিবর্গ হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সন্তকবিদের কবিতাও শব্দঘন, পঙ্ক্তিসজ্জায় কোনোরকম ঢিলেঢালা ভাব নেই। আবার প্রকরণের দিক থেকে রঞ্জন অনেকটাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছাকাছি। সুধীন্দ্রনাথ যদিও সনেট লেখেননি, কিন্তু তিনি সনেটকল্প কবিতা লিখেছিলেন; যার প্রমাণ পাওয়া যায় *সংবর্ত* কাব্যগ্রন্থের *বিপ্রলাপ*, *কঞ্চুকী*, *সোহংবাদ* কবিতাগুলির শব্দচয়ন ও গঠনশৈলী লক্ষ করলে।

সমাচার দর্পণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি—

১. জরার বিকল্প এক শ্যামধান্যমেঘ,

২. লোল জিহ্বা ঢেলে দেয় সবুজ গরল।

৩. এই ক্বাথ গোধূলির অবসন্ন রঙে

৪. মুদ্রার গণিত বোঝে নিতান্ত কষাই।

৫. ...যতোটা রুধির
সে আজ প্রস্তুত নিতে, ব'লো তাকে, 'আছে,
রসের আঘ্রাণ, স্বাদ, নারঙ্গের কাছে।'

৬. ...আমার রক্ত অধমর্ণ, সর্পদেবতার।

৭. ...সোনার রেকাব ছেড়ে ভঙ্গুর পিরিচে
তুমি কোন বন্দনার ফল?...

সমাচার দর্পণ-এর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রসূত হয়েছে কবির ধ্রুপদী মেজাজ থেকে। এবং এরই আনুগত্যে এসেছে চিত্রকল্প এবং আপ্তবাক্যের ধ্বনিস্পন্দন। এও লক্ষণীয়, কবির এই প্রথম কবিতার বইয়ের কবিতাতে নানা ঘটনা-আক্রান্ত সমসময়ও পরিত্যক্ত হয়নি। এই কাব্যপুস্তিকার নাম-কবিতার ৮ নম্বর রচনার কিছু পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি। লক্ষ করার মতো, ইতিহাস সম্বলিত দেশকালকে সনেটের দৃঢ়বন্ধনীতে কত সাবলীলভাবে সমসাময়িকে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন।

> রবার্ট ক্লাইভ, সমুদ্র পেরিয়ে তুমি আজ এসেছো যখন,
> আমার আতিথ্য নাও, খাওদাও, ঢাকাই মল্লিন নিয়ে তোমাদের
> হুইস্কি পাঠিও; জানো তো রিয়েল স্কচ, গথিক চ্যাপেল, আর
> মিশনারি আমাদের কী ভীষণ প্রিয়!...

এই পঙ্ক্তিগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণব্যঙ্গের তির বারবার যেন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আমাদেরই বুককে নিশানা করে।

ইনফেরনো বা *ম্যাকবেথ* যেখানেই যাই, দেখি, ধ্রুপদী কবিরা তাঁদের সমস্ত ব্যক্তিস্বরূপকে রক্ষা করেই, উচ্চারণে লুক্কায়িত রাখেন ব্যঙ্গের বক্রছুরিকা। তৈরি হয় শোণিতপ্লাবী চিত্রকল্প!

রঞ্জনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *মায়াবন্দর* প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। প্রথমেই চমকে উঠি, *উৎসর্গ / বাংলাভাষাপ্রেমিকেরে* সনেটটি পড়ে।

> সমুদ্র টেবিলে এসে এত চিত্রার্পিত যে তার কথামঞ্জরী
> আত্মারামে লৌহ হয়ে বেঁধে— জলে না ডুবলে পা, উন্নতি হবে না!

আশ্চর্য শব্দচয়ন— 'উন্নতি হবে না'। *মায়াবন্দর*-কেও কাব্যপুস্তিকাই বলব। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২, দু-ফর্মা। রঞ্জনের প্রথম বইয়ে কবির যে-মানসলোকের আভাস পেয়েছি, সেইটিই যেন পূর্ণতর অবস্থায় উপস্থিত এই বইয়ের কবিতায়। কোথাও যেন নিষ্ফলতার কষ্ট কবিকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে।

> সমস্ত জীবনই যার রবিবার— বিশ্রামের দিন,

এর থেকে বড়ো কষ্ট আর কী হতে পারে! উচ্চারণে এই কষ্ট আবেগের ঘনঘটা নিয়ে উপস্থিত হয়নি। সংযত বাক্‌ভঙ্গি। এতেই 'কষ্ট' দ্বিগুণ তীব্রতায় পাঠককে আলোড়িত করে তুলছে।

ওই *রবিবার* কবিতার শেষ ছয় পঙ্ক্তির থেকে দু-টি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি :

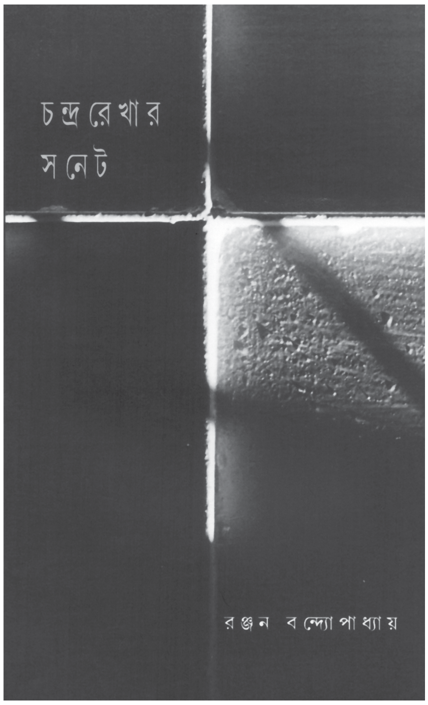
> ক্লান্তিকর চালগুলোয় ছোটোখাটো বুদ্ধির অভাব
> তারই পক্ষে যায় শুধু, মুচকি হেসে মৃত্যু হাত নাড়ে।



মায়াবন্দর, শ্যামনৌকা, ১৯৯২
প্রচ্ছদ অতীন ভট্টাচার্য



খণ্ডিত শ্লোকের দিনে, বাগীশা, ১৯৯৮
প্রচ্ছদ সনাতন দিণ্ডা



চন্দ্ররেখার সনেট, বোধশব্দ, ২০০৩
প্রচ্ছদ কৌশিক মুখোপাধ্যায়

এইসব পঙ্‌ক্তি পড়তে পড়তে শেক্সপিয়রের সনেটগুলির স্বরপ্রক্ষেপণকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে, রঞ্জনের কবিতা শেক্সপিয়রের সনেটের ভাবানুবাদ। আমার বলতে ইচ্ছে করছে, সনেটের প্রকরণ সম্ভবত সেই কবিরই প্রয়োজন হয় যার কষ্ট বোধগুলি জ্বাল দিতে-দিতে 'ক্বাথ'-এ পরিণত হয়েছে। এই অকৃতদার কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আত্মজৈবনিক প্রতিবিম্বন তাঁর কবিতায় কতটা ঘটেছে বলতে পারব না। শুনেছি, তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে এখন তিনি একাকী থাকেন। ছিমছাম বাড়ি, ছিমছাম জীবনযাত্রা।

মায়াবন্দর হচ্ছে এই জগৎপ্রপঞ্চ। জীবাত্মা এই বন্দরে প্রারব্ধপ্রসূত কিছুদিনের জন্য বসবাসের উদ্দেশ্যে আসে। ভ্রান্ত সুখ-দুঃখের খেলায় দু-দিন কাটিয়ে অন্যবন্দরে গিয়ে নোঙর ফেলে। এইভাবে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে একদিন জীবাত্মার মায়ামোহের অপনোদন ঘটে। এই মুক্ত আত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হয়।

রঞ্জনের এই *মায়াবন্দর*-এর শব্দসংকেত পাই কবীরের কবিতায়। নশ্বরতা ও মায়া সম্পর্কে রঞ্জনকৃত কবীরের কবিতার টীকায় পাচ্ছি : আগুন = ঈশ্বর-বিরহের আগুন, ঘরখানা = মোহ-মায়াময় পৃথিবী, ডাইনি = মায়া, অবিদ্যা, পাঁচ ছেলে = পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। এই মায়ামোহের বহু শব্দসংকেত দিয়েছেন কবীর। যেমন, ননদিনী, পাঁচসখী, তানপুরা ইত্যাদি। এই সমস্তই মায়ারই প্রতীক।

তাঁর *মায়াবন্দর* বইটিতে বিশেষভাবে চিত্রকল্পাশ্রিত প্রতীকের ছড়াছড়ি। প্রথম বই থেকে এই বইয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেছেন কবি। এই বইয়ের *স্বদেশে* কবিতায় :

> এদেশ চড়ক আর উচ্চকিত ঢাকের কাঠির,
> এখানে সিঁদুর পরে মহিলারা দু-রকম রঙে,
> শারদোৎসবের আগে প্রয়োজন বেশ্যার মাটির,
> বাক্যের বিন্যাসে মান্য প্রবচন হেঁয়ালির ঢঙে।

এখানে রঞ্জনও ওই মায়াময় জগৎকে প্রতীকত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক চিত্রের মধ্যস্থতায়। এখানে ধর্ম বলতে বুঝি চড়ক ও উচ্চকিত ঢাকের কাঠি। এখানে মহিলারা দু-রকম রঙের সিঁদুর পরে। এর অর্থ কি প্রকৃত সতী ও সাজা সতীর সিঁদুরের রঙের ভিন্নতা বোঝাতে চাইছেন কবি? কেন বেশ্যার ঘরের মাটি দুর্গাপুজোয় প্রয়োজন হয়? বেশ্যার ঘরে মানুষের কাম, কামনা, বাসনা, লালসা পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে। মা পৃথিবীতে আসেন কলুষমুক্ত করতে। তাই ওই মাটির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমাদের সমস্ত দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির ভিতর লুকিয়ে আছে নানা প্রতীক। 'মায়াবন্দর' একটি প্রতীক। কবির ভাষায় 'হেঁয়ালির ঢঙ'।

রেশমপথ কবিতার অন্তিম স্তবক শুরু হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি দিয়ে। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে—

> বড়োরাও ব্যতিব্যস্ত নিজেদের সময়সেবায়,
> স্বর্গের প্রবেশদ্বার বিদেশির পদার্পণ পায়।

লৌকিক অর্থে পঙ্‌ক্তি দু-টিকে নেওয়া যেতে পারে। ভারতে ইংরেজদের আগমনের উল্লেখও ধরতে পারি। ভারতবাসী যখন নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তারই সুযোগে বিদেশিরা ভারতের মতো স্বর্গের প্রবেশদ্বারে পদার্পণ করেছে। আবার লৌকিক অর্থ ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাসও দিচ্ছে এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়। 'বড়োরাও'— এই শব্দসংকেতে আছে বিষয়ী মানুষের কথা। 'বিদেশি'— এই শব্দসংকেতে আছে সংসারমোহচ্ছিন্ন মহাত্যাগীর কথা।

নিম্নচাপ কবিতায় এই মায়াসর্বস্ব জগৎকে কবি বলছেন :

> এ-শহর আস্তাবল, খুরে খুরে শব্দ হয় খুব।
> ...
> শহর— রে উন্মাদিনী, রোজ এত কাহিনী ছড়ায়,
> তবু তোর হুঁশ নেই, শেষ হলি যৌবনের প্রায়!

এই কবিতার বইয়ের কবিতাগুলিতে সূক্ষ্মে অবস্থান করছে সন্তকবিদের সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনাচিন্তা।

কবীর রচিত *বীজক : রমৈনী* থেকে কিছু উদ্ধৃতি—

১. শূন্যের মাঝে সহজ চিত্ত রইলে একক জ্যোতির উদয়—
সেই পুরুষের বলিহারি যাই, সেইজনা নিরালম্ব যে হয়।

২. বন্ধন মেনে ফলের আশায় বন্ধনই দিল দেবতা যে,
কবীর বলছে, দিনরাত্তির নামের স্মরণে উতরোয় সে।

৩. ইঁদুর-বেড়ালে একজোট হয়ে কী করে যে থেকে যায়!
অবাক ব্যাপার দেখো হে সন্ত, সিংহকে হাতি খায়।

আবার, *বীজক : সাখী* অংশে পাই—

ত্রিলোক হয়েছে পিঞ্জর আর পাপ-পুণ্য তো জাল,
সকল জীব যে হরিণ হয়েছে, ব্যাধ এক শুধু কাল।

কবি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যভাষায় আমরা দেখছি সেই নরকের দৃশ্য, শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা, ঊর্ধ্বলোকে যাত্রার একটি অভিমুখ।

গ্রাহক, হে পল্লবিত দ্রুমদল, মূলরস আমিও পাঠাই—
কিছু তা বৃষ্টির, কিছু পশুর রেচনে মাখা পশুর বিষ্ঠাই।

(*মায়াবন্দর* পুস্তিকার চতুর্থ মলাট)

বিশেষত *মায়াবন্দর* কাব্যপুস্তিকাটিতে লক্ষ করা যায় সন্তকবিদের কবিতা অত্যাশ্চর্যভাবে আত্তীকরণের দক্ষতা। এই আত্তীকরণের দক্ষতাই কবিতার ইতিহাস, কবিদের পরম্পরা। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভিতর দিয়ে কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিতার পুনর্জন্ম ঘটেছিল।

একমাত্র *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে* (১৯৯৮) বইটির কবিতাগুলি সনেটের বন্ধন ভেঙে মুক্ত অক্ষরবৃত্তের ছান্দসিক বাহন গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ভাষা বা শব্দপ্রয়োগে বা পঙ্‌ক্তিনির্মাণে সনেটের দৃঢ়বন্ধনের শিক্ষাকে রঞ্জন পরিত্যাগ করেননি। যেমন অব্যাহত থেকে গেছে নিজের ঐশী অসাফল্যের কষ্টের উপস্থাপনা।

১. 'সাইরেন সাইরেন', বাতাস বলছে, আর
মনোবেড়ি শক্ত হয়ে চাপ দিচ্ছে অসম্ভব, হে উড়াল,
ছিঁড়ে ফেলতে চেয়ে আমি বন্ধন আরো বেশি
...
মকরবীণা কি তবে তাঁতকল, আজনবি!

(*আজনবি আর হাসিনা ১*)

২. তাছাড়া ঈর্ষা আছে—
যৌন ঈর্ষা থেকে যৌন বিদ্বেষ সবই
একে একে কাতারে কাতারে আরো মিছিলের মুখ;

(*আজনবি আর হাসিনা ৯*)

৩. না কি চতুর মাত্রাগুলো
শব্দের শ্মশানে এসে
বিষাদঘুমন্ত এক আজনবির গায়ে এক হাসিনার
পদস্খলন হয়ে
জিভ কেটে লজ্জায় থমকে গিয়েছে!

(*আজনবি আর হাসিনা ১৩*)

৪. মায়াশকুনির হাসি— প্রতিহিংসা— নির্বাসন,
বনপর্ব শুরু হয়।

(*সুতোর গান ৯*)

লৌকিক ও অলৌকিক মিলেমিশে রঞ্জনের কবিতা বর্তমান বাংলা কবিতায় একটি স্বতন্ত্র ও নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে মা কালীর দর্শন পেলাম আজনবি ও হাসিনার মধ্যবর্তিতায়। এই কবিতাটি তো বটেই, উদ্ধৃত বাকি কবিতাগুলিও একাধারে জাগতিক, মহাজাগতিক এবং মহাকাব্যিক।

প্রথম কবিতার বই থেকেই রঞ্জনের কবিমানসিকতা পরিপক্ব। পরবর্তী কবিতাগ্রন্থগুলিতে ওই পরিপক্বতা আমাদের গোচরে-অগোচরে বেড়ে চলেছে। অনেকটা লাটাই থেকে ঘুড়ি-ওড়ানোর সুতো ছাড়ার মতন। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতায় গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন আছে। কারণ আপাতভাবে এই কবির ভাবলোক একই অবস্থানে। প্রাকরণিক কলাকৌশলেও আপাতদৃষ্টে কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। একমাত্র এই *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে* কাব্যগ্রন্থটি ছাড়া। এতৎসত্ত্বেও চারটি বইয়ের কবিতার স্বাদে কোথাও যেন বিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। তুকারামের মিতায়তন 'অভঙ্গ' কবিতাকে রঞ্জন বলেছেন, এ হচ্ছে সন্তকবির 'অন্তর প্রকৃতির প্রতিবিম্বন'। রঞ্জন এও বলেছেন, এইসব রচনা সন্তকবিদের 'ইন্‌টিমেট জর্নাল'।

নেই কাজকম্মে,
যত্ত নিকম্মে! মুখে ঝরে নাল

(৭— ন করৱে ধন্দা)

এ কথা নিজের সম্পর্কেই বলেছেন তুকারাম। তাঁর রচনায় একটি মহাঅসন্তোষের ক্রিয়া অব্যাহত।

তুকা বলে, অলংকার
অপছন্দ ব'লে তার
তাড়া করে ফেরে মাগী, কুকুর যেমন।

(৭— ন করৱে ধন্দা)

এই সমস্ত উক্তিতে তুকারামের আত্মজৈবনিক তথ্য লুকিয়ে আছে। রঞ্জনের আত্মজৈবনিক তথ্য আমার অজানা। কিন্তু তাঁর রচনায় তুকারামের মতোই মহাঅসন্তোষ ক্রিয়াশীল।

রঞ্জনের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *চন্দ্ররেখার সনেট*-এও (২০০৩) কবীর ও তুকারামের আত্মধিক্কার প্রতিধ্বনিত।

১. বে-তার হয়েছে বীণ। সাধে লাউ কে-বা আর!
শান্তি ওই ঋক্ষদূর— পাই না তো বরষার
পুব হাওয়া, ইচ্ছামূলে কল্পশান্তিনিকেতন।

(*রবিমরশুম*)

২. প্রেমিকের ঘর ভেবে প্রবঞ্চক চিনে শেষে
শব্দভোগে অন্ধগলি পেরিয়ে যে নির্বিকার,...

(*লগন গান্ধার*)

৩. শরতের প্রসন্নতা পায়নি যে-শব্দগুলি,
এখন বেগানা হয়ে কোনখানে যাবে আর?
...
মুদ্রণের আগে আত্মা পঞ্চানন কর্মকার—
চুল্লির তাপের মান জানতে চায় সারাক্ষণ।

(*অক্ষর ও আহিতাগ্নি*)

৪. নাহলে পাতাল থাকে— বহ্নিমান পথরেখা,
মন পুড়ে গেলে, কবি, কীভাবে সারাব রোগ—
বলে দাও, কও কথা দূরভাষে আমরণ।

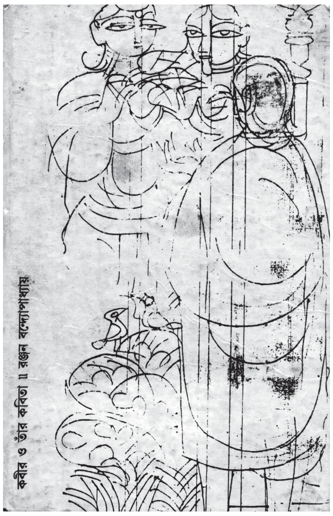
(*উতল নির্জন*)

৫. নিজেকে সেঁকেছি আমি যখন নিজের আঁচে—
সেদিন সৌরভ দিয়ে ঝরে গেছে গন্ধরাজ,
তুমিও নিজের মতো পিঠ ফিরে থাকো আজ।

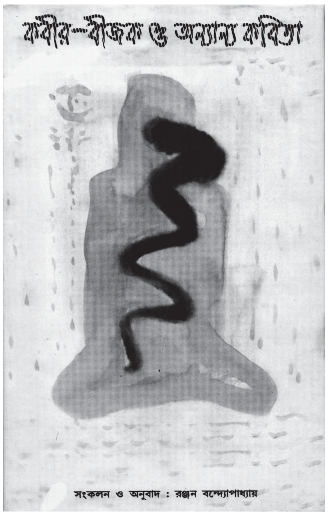
(*দূরযায়ী*)

৬. দর্পণের তল থেকে রত্নবিম্ব তুলে আনে,
অথচ মৃতেরা চায়, জীবিত রুধির দিয়ে
শব্দে হোক মৃত্যুলেখা এবং থাকুক ধ্যান।

(*রৌদ্রছায়া*)



কবীর ও তাঁর কবিতা
প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫
প্রচ্ছদ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়



কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা
সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১
প্রচ্ছদ অলোক সোম

৭. পুরোনো ঘি-এর ফেরি তোলে না তো আলোড়ন,
কাল নিজে ঢাকিসুদ্ধু দিয়ে যায় বিসর্জন।
বনেদি বাড়িও ভাঙে। শতাব্দী নতুন হয়।

(*ঘূর্ণি*)

৮. সন্ত চাঁদ উঠে এলে ভাষাজাগতিক ঋণে
সেই নীরবের মাঝে আমার বিরহ জ্বলে।

(*জলেশ্বর*)

এই উদ্ধৃতিগুলি খুব গভীরভাবে নাড়াচাড়া করলে রঞ্জনের কবিতার ভাবাত্মা ও শব্দশরীরের তাৎপর্য ধরতে পারি। মনের অন্তস্তলে যাঁর গভীর অসন্তোষ বাসা বেঁধেছে, তিনিই জাগতিক কষ্টকে মহাজাগতিক ঋণে আবদ্ধ করতে পারেন। *জলেশ্বর* কবিতায় কবি সন্তকবিদের কাছে তাঁর ঋণস্বীকার করেছেন। বলেছেন : 'সন্ত চাঁদ উঠে এলে ভাষাজাগতিক ঋণে'। এই মহাঋণে আবদ্ধ তখনই হওয়া যায় যখন 'কাল নিজে ঢাকিসুদ্ধু দিয়ে যায় বিসর্জন'। বড়ো দুরূহ এই যাত্রাপথ যেখানে 'শব্দে হোক মৃত্যুলেখা এবং থাকুক ধ্যান'।

আমার নিজের ধারণা, কবিতাকে রঞ্জন যতদূরেই নিয়ে যান ভবিষ্যতে, তাতেও তাঁর শব্দে যেমন মৃত্যুলেখা থাকবে, তেমনি থাকবে ধ্যান। কবীর ও তুকারামের মানসলোকের ঐশী অতৃপ্তি রঞ্জনের কাব্যাত্মা বা তাঁর অন্তরাত্মার ভিতরের বস্তু। কারণ 'নিজেকে সেঁকেছি আমি যখন নিজের আঁচে'।

পুনরুক্তি হলেও বলতে হচ্ছে, তত্ত্বমসির ধ্যান ও বিচ্ছুরণ রঞ্জনের কবিতায় দেখতে পাব যদি তাঁর কাব্যযাত্রাকে প্রথম থেকে পর পর আমরা লক্ষ করে যাই।

তুকারামের তিনটি পঙ্‌ক্তি এবং রঞ্জনের *শব্দবিবাদ* কবিতার চারটি পঙ্‌ক্তি তুলছি। এই উদ্ধৃতির দ্বারা নির্দেশ করতে চাই, এই জাতের কবির সামান্য ধর্ম হচ্ছে নিজের স্বরূপকে চেনার নিরলস ধ্যান, অসফলতা, তবু অনবচ্ছিন্ন ধ্যান :

তুকা ভণে, একাদশী
ব্রত ভালো, উপবাসী
হয়ে আমি জাগরণে কাটালাম বেশ।

(তুকারাম)

পিঁপড়ের পায়ু চিপে শব্দ বার হলে আমি
প্রপঞ্চের পাঠক্রমে বুঝি সেও তামসিক।
অলৌকিক কুলীনের বহুজাত আশ্রমিক
ওষধির গুণে আর হব কি সেপথগামী?

(রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমি বলতে চাই, কবি হিসেবে ভাষাজাগতিক ঋণে রঞ্জন আবদ্ধ বলেই, তাঁর ধ্যানজগৎ আত্মখননে রক্তস্রাবী। কারণ সন্তকবি অনুপ্রাণিত রঞ্জনের কবিতার অভিমুখ ভাষারও ঊর্ধ্বে। মহাজাগতিক। তাই তাঁর কবিতার শব্দসমূহ ঋজু, অপরিবর্তনীয়, এবং ধ্যানপ্রসূত।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

‘পাঠকেরও তো একটা প্রস্তুতি দরকার, তার দিক থেকে স্ট্যাগনান্ট থাকবে, আর যে লিখছে তারই যত দায়— এভাবে কতদিন চলে!’

ক থো প ক থ ন

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চার দশক ছুঁয়ে থাকা কবিতাজীবনের কথা। নিজের লেখার প্রসঙ্গ কিংবা অনুবাদ। মিলল তাঁর কাব্যভাবনার নেপথ্যে থাকা বিবিধ অনুপ্রেরণার হদিশও। টুকরো কথাবার্তার বাহুল্য কমিয়ে কথোপকথনটি যথাসম্ভব ধারাবাহিক ও প্রাসঙ্গিক করা হল। *বোধশব্দ*-র পক্ষ থেকে কবি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় **অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়**।

উনিশশো আশির দশকে চতুর্দশপদী লেখার চল তেমন চোখে পড়ে না। অথচ তোমার প্রথম বই *সমাচার দর্পণ*-এ এই ফর্মকে বেছে নিয়েছ। কেন বাছলে? প্রথম থেকেই প্রকরণ-সচেতন থাকার দরুন?

অনেক দিন হয়ে গেল— তিনটে দশক, কম নয়, একটা শতাব্দীও ফুরোল... এতদিন পর এসব প্রসঙ্গ তুলছ... ওখানে তো ষোলোটা লেখা, দুটো অংশ ধরলে— ‘শীতল চৈতন্যের ফণা’ আর ‘সমাচার দর্পণ’— ক-টাই-বা কনসিডার করবে চতুর্দশপদী গোত্রে? মেরে-কেটে বড়ো জোর সাত-আটটা, বাকিগুলো তো নয়। বরং দ্বিতীয় *মায়াবন্দর*-এ, যেমনই হোক, সবমিলিয়ে হয়তো ওই গোত্রে ফেলতে পারো। তবে লেখার সময়টা আরও পরে, নব্বইয়ের গোড়ায়...

হ্যাঁ, ও-প্রসঙ্গে পরে আসছি, আমার প্রশ্নটা কিন্তু...

কী বলব! সেরকমভাবে ফর্ম বেছেটেছে তো লেখা হয় না। এককেটা লেখা যখন যেমন হয়ে ওঠে। চলতে চলতে কিছু-একটা খাড়া হয়, নাহলে শেষ অবধি কিস্সু হয় না। তুমি তো প্রথম থেকে ভেবে নিয়ে তেমন কিছু করে উঠতে পারবে না। লেখাটা তোমাকে দিয়ে নিজে হয়ে উঠতে পারে যদি... ভালোমতোই জান, নিজেও লিখেছ, লিখছও, ভেতরকার ব্যাপারস্যাপার কি প্রকাশ করা যায় সেভাবে? ঘন একটা অবস্থা— অনেক কিছু নিয়ে সান্দ্র কোনো অনুভব, সেটা বিমূর্ত— কনডেন্সড সেই সিচুয়েশন, বা হাল, একটা দশার ভেতর যেন পড়েছ! বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে উইথড্র করে, মানসিকতা এমনই যে সবের মধ্যে থেকেও কোথাও নেই, এইরকম অবস্থায় পড়ে যখন লিখছ— লেখা তো হয়ে উঠবার জন্য তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে... তোমার যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সেখানে প্রিঅকুপায়েড হওয়া কি সম্ভব? এমনকী কোনো লেখা শেষ অবধি সিরিজ হয়ে উঠবে কি না, আগে থেকে তার কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। শুধু চতুর্দশপদী নয়, অন্য ধরনের কোনো লেখার চক্করে পড়েছ— বাইরে বেরোনোর জন্য পোশাকটা কী পরবে তোমার লেখা, আগে থাকতে সেটা ঠিক করে দেওয়া যায় কি? লেখা নিজেই সেটা চয়েস করবে। সে তো তোমারই সত্তার অংশ, জীবন্ত, ততক্ষণই, তোমার সঙ্গে তার লিপিরূপে যে-সম্পর্ক, তার বিচ্ছেদ যতক্ষণ না হচ্ছে। এই আর কী।

তা ছাড়া ওই সময়, অল্প বয়েসে মনই বল বা চোখই বল, অনেকটাই তো এখনকার চেয়ে আলাদা ছিল, যেমন থাকে। সেইসঙ্গে নিজস্ব প্রবণতার ব্যাপারও কিছু থেকে যায়। যেকোনো বিষয়কে গ্র্যাস্‌প্‌ করার ক্ষমতা— কিছু একটা লিখে দেখার আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল, ন্যাচারালি একটা আগ্রহ ছিল। ওই যে চল থাকা-না-থাকার কথা তুললে, খেয়াল করে দ্যাখো, হয়তো তুমি অনেক পরে পড়েছ— সেটাই স্বাভাবিক, উনিশশো বিরাশিতে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের *রাত্রি চতুর্দশী* বেরিয়েছিল চোদ্দোটা লেখা নিয়ে। যদিও উনি সেক্ষেত্রে ‘সনেট-সংগ্রহ’ বলেছিলেন টাইটেল পেজে, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে রিপ্রিন্টের সময় ওই দাবিটা প্রত্যাহার করে বলেন, ওই গোত্রের লেখাগুলো ‘চতুর্দশী’ মাত্র। তো যেমনই হোক, সেসব ফলো-আপের মানসিকতা ছিল। তা ছাড়া মধুসূদন তো সেই কোন ছোটোবেলা থেকে আমরা সকলেই পড়েছি স্কুলপাঠ্য হওয়ায়, তার বাইরেও যে যেমন পারি পড়েছি, আবার আধুনিকদের ভেতর স্টলওয়ার্টদেরও— সেসব মিলিয়ে তো একটা রসায়ন ঘটেইছিল। তখন ওসব লেখা ঝরঝর করে বেরিয়ে এসেছে। যেন মুখস্থ ছিল আগে থেকে। কেবল লিখে যাচ্ছ— কাটাকুটি প্রায় নেই বললেই চলে। এরকম পরেও হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত... কিন্তু ফর্ম বাছাবাছির তেমন কোনো কিছু ছিল না— ওরকম হয়ে উঠেছিল, হয়ে ওঠে, খনিগর্ভ থেকে আকরিক উঠে আসার মতো, রিলকে লিখেছিলেন না *সনেট টু অর্ফিয়ুস*-এ।

বোঝলাম! আরও একটা প্রশ্ন— *সমাচার দর্পণ*-এর বিষয়বস্তু সে-অর্থে বিস্তর ‘প্রাগাধুনিকতা’-কে আশ্রয় করে রয়েছে, এটাও তোমার সমসাময়িকদের কাছ থেকে তোমাকে আলাদা করে রাখে। কেন হঠাৎ এরকম আশ্রয় করলে? তুমি কি ক্লাসিসিস্ট?

তুমি তো আমাকে রীতিমতো জবাবদিহির টিলায় বসালে দেখছি!

তা একটু বসলেই না হয়। এতদিন লেখালেখি করছ, দুটো কতা যদি পেরান খুলে কও, ক্ষেতি কী বাপু! লোকজন পড়বে, কও দিকিনি।

লোকজন কি সত্যিই কিছু পড়ে আজকাল? আমি কে, যে লোকে আমার কথা পড়বে বা শুনবে? তা ছাড়া ওসব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী?

অত লাভালাভ কষতে হবে না তোমায়, পারলে বলো যা জিগেস করলাম।
প্রি-মডার্ন পিরিয়ডের কথা যা বলছ, সেসব তো তখনকার আমির যে-ধরনের চর্চা ছিল তার রিফ্লেকশন। বাড়ির কাছেই বড়ো একটা লাইব্রেরি— তার রিডিং-রুম, সিঁড়ি আর থামে ঠেসান দিয়েই তো দিনদুপুর কেটেছে কত। পাশেই গঙ্গা— বিভিন্ন ঘাট, বন্ধুদের আড্ডা, দূর থেকে ভেসে আসা ভোজপুরি ভাষায় মাঝিমাল্লার গান, দূরে বালি ব্রিজ, দু-পা এগোলে বালি লাইব্রেরি— সবমিলিয়েই তো বেড়ে ওঠা। তা ছাড়া উত্তরপাড়ার মতো একটা জমিদারদের জায়গায় থাকলে যা হয়, এখন অবশ্য তা নয়, তোমাদের দক্ষিণেশ্বর-আড়িয়াদহের অনেক আগে এখানে কোপ পড়েছিল, পুরোনো বাড়িঘর, গলি, রাস্তা, আলো-আঁধার, লোকজনের কথাবার্তা, অলওয়েজ স্মৃতিচর্চা— কী ছিল কী নেই ইত্যাদি, সেসবের ছাপ তো পড়বেই। সেটা অস্বাভাবিক ছিল না। আর, প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিকতাও ফ্যাক্টর করে। একই জায়গায় থেকেও, আমাদের বন্ধুবান্ধব যারা কবিতাচর্চা করত, তাদের লেখায় তো ওরকম কোনো রিফ্লেকশন লক্ষ করিনি। একটা সময় অবধি আমাদের পড়াশোনার ধরনেও কিছুটা মিল ছিল— চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান, ওঠাবসাও ছিল একসঙ্গে, যাকে বলে যৌথজীবন। অনেকদিনই সেসব চুকেবুকে গেছে। সে যা হোক, কিন্তু তুমি যে 'ক্লাসিসিস্ট' তকমাটা আমায় দিতে চাইছ, সত্যি বলতে, ওটার দায়িত্ব নেওয়ার মতো বুকের পাটা তত চওড়া নয়। কয়েকটা সিম্পটম দেখে ডিসিশন নিয়ো না, ওতে রুগির অকল্যাণ হবে।

না, না, আমি তো কোনো ডিসিশন নিইনি, তোমায় শুধিয়েছি মাত্র...
ওই হল, একটু ঘরপথে যা। আগে বাড়ো।

বুয়েচি। রাত আভি বাকি হ্যায়... তোমার দ্বিতীয় বই *মায়াবন্দর* কার্যত প্রথমের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। *সমাচার দর্পণ* যেখানে একটা শিকড়ের সন্ধান করে, *মায়াবন্দর* সেখানে অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। এটার রহস্য কী?
রহস্যটহস্য কিছু নেই। উনিশশো ছিয়াশিতে লেখা প্রথমটা, আর উনিশশো নব্বই-একানব্বইয়ে দ্বিতীয়। সময়ের তফাতটা ফ্যাক্টর করবে না? কীসব ঘটছে তখন, ভাবো তো। সোভিয়েত ভেঙেছে, বার্লিন ওয়ালও, ওদিকে তিয়েনানমেনের ঘটনা, কুয়েত দখল নিয়ে ইরাক-ইরান বিবাদ— মাঝে মার্কিন দুনিয়াদারি, আবার আমাদের এদিকে নয়া অর্থনীতির সূচনা, রামজন্মভূমি নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাল ঠুকছে— তখনও বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়নি, পাশাপাশি আমাদের চেনাজানা সামাজিকতা বদলে যাচ্ছে, নানারকম লোচ্চামি— এই সব কিছু দেখেশুনে তো একটা প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, নার্ভগুলো তো আর স্টিলে তৈরি নয়, ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। *সমাচার দর্পণ*-এর জগৎ থেকে অনেক আলাদা— অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের টানাপোড়েনেই। আবার ওইসময় ভ্যানগঘের মৃত্যুশতবার্ষিকীও ছিল। *মায়াবন্দর*-এর শেষ লেখাটায় গঘের কয়েকটা ছবির উল্লেখও তোমার জানা বিষয়। একানব্বইয়ে আমাদের এখানে 'শিল্পীশিবির' শীতে না হয়ে মার্চে হয়েছিল। ভ্যানগঘের স্মরণে উৎসর্গের ব্যাপারও ছিল। তার দরুন ওই লেখাটা আমায় লিখতে হয়। ওটা রং-তুলিতে লিখে মাঠে ঢোকার মুখেই শো করা হয়েছিল, পোস্টার ধরনে। আমার মাকে তেরোই মার্চ পিজিতে ভরতি করা হয় রাত পৌনে একটার সময়। ভাই আর ওর বন্ধুরা মিলে নিয়ে যায়। বাড়িতে বাবা আর আমি। সেই রাতে অত টেনশনেও পরের দিন লেখাটা সাবমিট করার জন্য কপি করেছিলাম। কী করে পেরেছিলাম, কিচ্ছু বুঝতে পারি না এখন। তারপর সারা বছরটাই বাড়ি আর হাসপাতাল করতে হয়েছে। ওর ফাঁকেই, মাঝে মাঝে লিখেছি— হয়তো দু-তিন মাস বাদে বাদে। তা ছাড়া কবীরের গদ্যাংশও তার মাঝে লিখতে হয়েছে, কবিতার অনুবাদ অবশ্য আগে করা ছিল। ওই একানব্বইয়ের শারদীয় *প্রতিক্ষণ*-এ প্রথম প্রকাশ। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ইলাসট্রেশন ছিল। মাকে তখন অ্যাসেম্বলি অব গডচার্চে ভরতি করা হয়েছিল। পুজোটা বোধহয় ওখানেই কেটেছে। তারপর বিরানব্বইয়ের পাঁচই জানুয়ারি তো চলে গেল। *মায়াবন্দর*-এর পাণ্ডুলিপি তখন সুকিয়া স্ট্রিটে বিশ্বকর্মা প্রেসে, রতিকান্ত নস্করের হাতে কম্পোজ হচ্ছে। সেই অশৌচের সময় ওই পোশাকেই ওখানে প্রুফও দেখেছি। বলতে বলতে এসব কথা চলে আসছে। কী আর করা যাবে। ওই সময়, মানে, লেখালিখির পর্বে, তুমি তো চেন আমাদের সমসাময়িক গৌরীশঙ্কর দে-কে, তখন বালিতে থাকত, নিয়মিত যোগাযোগও ঘটত ওর সঙ্গে। নানারকম আলোচনাও হত ওইসব লেখা নিয়ে, কবীর প্রসঙ্গেও। অধিকাংশ লেখারই ও-ই ছিল প্রথম পাঠক, প্রকাশকও। বইটার প্রচ্ছদ করেছিল আমাদের আরেক বন্ধু অতীন ভট্টাচার্য, স্ক্রিন প্রিন্টও ওরই করা।

এর পরেই তো লেখা হয় *দিওনিসুস বা মহেশ্বর*— দীর্ঘকবিতা। *প্রতিক্ষণ*-এ ইলাসট্রেশন-সমেত বেরিয়েছিল। তাই তো?
হ্যাঁ। তিরানব্বইয়ের মার্চে বেরোল গায়ক সুমনকে নিয়ে লেখাটা— *সুমনের মুক্তধারা : সবুজের অভিযান*— আর মে মাসে ওই 'দিওনিসুস'। ওই সংখ্যাতেই রূপা দাশগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর দে এরকম আরও কয়েক জনের কবিতাও ছিল।

এখানে তুমি আবার শিকড়কে খুঁজেছ। কিন্তু সে-শিকড় কোনো দেশ বা কালের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নয়। দিওনিসুস থেকে মহেশ্বর— একটা পালটা ক্যাননকে খোঁজার চেষ্টা। কিন্তু এই কবিতাকে গ্রন্থভুক্ত করনি কেন? কিছু বলো এটা নিয়ে।
বহুদিন হয়ে গেল। বলতে গেলে প্রায় গতজন্মের কথা... বই করার কথা হয়তো ভেবেছি, কিন্তু অবস্থাগতিকে শেষ অবধি হয়ে ওঠেনি। করলে, সেপারেট একটা দীর্ঘ কবিতা নিয়ে— তা ছাড়া, উইদাউট নোটস করা যেত না। *প্রতিক্ষণ*-এ যখন বেরোয়, একটা ভূমিকা ছিল, তোমার হয়তো মনে আছে, ধরতাই হিসেবে ওটা দিতে হয়। সেটাও রি-রাইট করলে ভালো হত। কোনোটাই হয়ে ওঠেনি। ওই সময়, বিরানব্বইয়ের গোড়ায় মায়ের মৃত্যুর মাস দুয়েক পর থেকে আবার লেখালিখিতে মন দেওয়ার চেষ্টা করি। তিন ভাই-বোন আর বাবা— চার জনের বসবাস। সম্ভবত মার্চ-এপ্রিল থেকে মে-জুনের ভেতর তিনটে বড়ো লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে ওটাই সব শেষে, সবচেয়ে বড়ো। পরে অনেক বার নানারকম সংশোধন চলেছিল। তো, পরের বছর ওটা বেরোল। বাকি দুটো পড়েইছিল। তার একটা *ওমেগা ওয়ান*— পঁচানব্বইয়ে বেরোয় 'ধৃতি' নামে একটা পত্রিকায়, কল্যাণগড় থেকে। জহর সেনগুপ্ত ছেপেছিলেন। ওটা সমসাময়িক বিষয়-আশয় নিয়ে। একদিকে মহাকাশযান গড়েছে মানুষ, আবার অন্যদিকে পরিবেশে ভারসাম্যটাই যে প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের এতদিনকার সভ্যতায়, তারপর অবিরত যুদ্ধবিগ্রহর প্রভাব— তখন তো গালফ ওয়ার চলছে, তা ছাড়াও আমাদের ভেতরকার বিরোধ— বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সবমিলিয়ে নানারকম ভাবনার একটা ছাপ পড়েছিল ওটায়। আর একটা, ওই তিনের প্রথমটা, 'নির্জন সংলাপ' নামে বেরিয়েছিল, শতাব্দী পেরিয়ে, বছর সাত-আটেক আগে, বর্ধমান থেকে সাগর মুখোপাধ্যায়ের *বিন্দুবিসর্গ*-এ। ওটা একেবারেই আমাদের মানসিক টানাপোড়েন, হয়ে থাকা আর হয়ে ওঠা— বিয়িং আর বিকামিং— ক্রিয়েটিভ ইম্পালশন, কনস্ট্রাকশন— এই জাতীয় বিষয়ের, বিমূর্ত বিষয়-আশয় নিয়ে ছিল। তুমি ওই দুটো দেখনি সম্ভবত। এসবের অনেক আগে, *সমাচার দর্পণ*-এর পর, সেই প্রথম দীর্ঘকবিতা লিখি। ছাঁদবদল না করে, একটাই ছন্দে— *স্তম্ভ*। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ছেপেছিলেন *পুনর্বসু*-র প্রথম সংখ্যায়। খুবই রোমান্টিক ধাঁচের, প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখার রিঅ্যাকশনে। অল্প বয়েসে যেমন হয় আর কী। তার পরেও বিভিন্ন সময়ে কয়েকটা লেখার চেষ্টা করেছি। বেরিয়েওছিল, *জনপদ, অভিমান, কবিতাকথা*-এ। নানারকম বচন-উদ্গার যখন যেমন হয়েছে।

যাবতীয় বিষয় তো মাথায় গজগজ করছিলই। ওইরকম একটা মিথিকাল ক্যারেক্টার হন্ট করত বহুদিন যাবৎ। হয়তো দেখেছ, মনে নাও থাকতে পারে, ডায়োনিসাসের উল্লেখ *সমাচার দর্পণ*-এও আছে। গণেশ প্রসঙ্গেও পাবে, *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে*-র *বিনায়ক*-এ। কিন্তু নানারকম তথ্য, পেইন্টিং দেখা সত্ত্বেও গ্রন্থনা

করব কীভাবে, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আবার এসকাইলাসের নাটকে যা পেয়েছিলাম, তা খুবই ইন্সপায়ার করে। যদ্দুর মনে পড়ছে, ওই নব্বই দশকে গোড়ার দিকে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে পিকাসোর একটা এগজিবিশন হয়েছিল। সেখানে পিকাসোর কয়েকটা এচিং ছিল— লাল চকখড়িতে আঁকার মতো এফেক্ট। ঠিক ত্রিশূল নয়, দ্বিশূল পাশে রেখে কোনো যোগীপুরুষের মতো, কেউ বসে আছে। অনেকটা শিবের মতো। নিরলংকার ড্রইং। সেটাও বেশ ইন্সপায়ার করে। মিথ— সে পশ্চিমি হোক কি পূর্বী, আকর্ষণ করত। পৌরাণিক গল্পও আমাদের। এসবে আকর্ষণ অনেকের থাকে না... 'দিওনিসুস'-এর ক্ষেত্রে, একটা পরোক্ষ সাহায্য ছিল *কবিতাকথা*-র সম্পাদক সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের। ট্রাভিনস্কির 'রাইট অব স্প্রিং' শুনিয়েছিলেন একদিন। নৈহাটির গঙ্গার পাড়ে, বিকেলের দিকে। কী বলব, সে মারাত্মক! তার আগে ওরকম কিছু ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকে শুনিনি। সম্ভবত উনিশশো তেরোয় কম্পোজড। শোনা কথা, পশ্চিমি সংগীতজগতেও নাকি সে বৈপ্লবিক হয়েছিল। যা হোক, সেই শোনার অভিঘাতেই টিপনিটা পাওয়া গেল। অনেকদিন সন্তোষদার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। খুব স্নেহ করতেন, নিশীথদার (ভড়) মতোই। নিশীথদার সূত্রেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়...

বুঝতে পারছি, মিউজিকটাই তাহলে এগোতে সাহায্য করেছে। ওর ভেতর সেসব তো রয়েছেও...

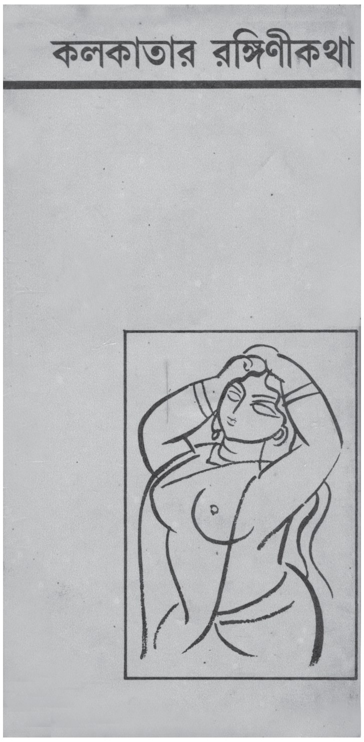
হ্যাঁ, ন্যারেশন যেসব জায়গায় আছে, খেয়াল করেছ নিশ্চয়, একটা এপিসোড থেকে আরেকটায় যেতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে— সবমিলিয়ে একটা অর্কেস্ট্রেশন। এমনকী বিভিন্ন জায়গায় ডান্সের কথাও আছে— নিম্ফদের ছাড়াও বাক্কসের সঙ্গিনী বা বাকান্তিদের। তারপর ধরো, গ্রিক নাটকের কোরাসের কথা মনে রেখে এক-একটা স্বরই যেন জীবন্ত সত্তা নিয়ে হাজির— ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি। সবমিলিয়ে যেন অপেরা চলছে। কখনো সোলো ভয়েস, কখনো কোরাস, জনতার মিছিল, আবার একক চরিত্র কোথাও। গ্র্যানজার। আর সেটা কোনো স্টেজে নয়। তোমার কল্পলোকের মঞ্চে ঘটছে, নিজে দর্শক হয়ে তার প্রতিবেদন লিখছ মাত্র— অনুবাদ করছ কল্পনার, নির্জনে, টেবিলে বসে তোমার কাগজ আর কলম দিয়ে। চিরকাল যা করে এসেছে লোকে, তুমি সেটাই করছ। যাক, অনেক কথা বলা হল, আর নয়। ভাল্লাগছে না, ও নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে এখন।

সেখান থেকে *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে*। এতেই রয়েছে *আজনবি আর হাসিনা* সিরিজ। 'সুতোর গান' নামে আরও একটা। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এই ধরনের সিরিজের প্রকাশ অবাক করেছিল। মনে হয়েছিল, তুমি তখন থেকেই কোনো রহস্যবাদী কাল্টের চর্চা করছ। সেখানে আমাদের পরিচিত ভাষার সংস্থান অনুপস্থিত। এই নতুন সংস্থানকে কীভাবে ভাবলে? পরে তোমার লেখা প্রবন্ধ *সুফি-সন্ত-বাউল* পড়ি। মনে হয়েছিল, *আজনবি আর হাসিনা*-র বীজ সুফিচর্চার মধ্যেই রয়েছে। এই ব্যাপারে কিছু বলবে? হয়তো সুফির সূত্র ধরেই বলা যায় তোমার সন্তদের নিয়ে চর্চার কথা। কবীর— বীজকের অনুবাদ। এই চর্চা কতটা প্রভাবিত করেছে তোমার ব্যক্তিগত কবিতাচর্চাকে?

তোমার এই প্রশ্নের মিছিল পার হই কী করে! মহা ঝকমারি হল দেখছি।

বা রে! এই তো সামান্য ক-টা, অন্যায্য কিছু? এক এক করে বলো।

খণ্ডিত শ্লোকের দিনে-র তো তিনটে পার্ট। প্রথম আর শেষেরটা দুটো সিরিজ, মাঝে গ্রন্থনামের অংশটায় বিচ্ছিন্ন কিছু লেখা বিভিন্ন সময়ের। না, কোনো রহস্যবাদী কাল্টের চর্চা কখনো করিনি, যেটা তোমার মনে হয়েছিল। আর ভাষার ব্যাপারটা যা বললে, সে-দিক থেকেও ওখানে পুরোটা তা নয়। হয়তো *সুতোর গান* অংশটা তোমার কাছে ততটা স্পষ্ট না হয়ে থাকতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তার দরুন ওরকম ভাবতে গেলে কেন! *আজনবি আর হাসিনা* অনেকটাই কথোপকথন ধাঁচে লেখা, সমসাময়িক বিষয়-আশয় ছাড়াও সেখানে রোমান্সও রয়েছে। দু-জন নারী-পুরুষের সঙ্গে তৃতীয় একজনের নানারকম প্রসঙ্গে কথাবার্তা। বন্ধুর সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হয়। একটা এক্সপ্রেশন ঘটে যেমন— অনেক সময় হয়তো একতরফাই, নীরব থাকে শ্রোতা। একরকম সলিলোকি— স্বগত সংলাপ যেন... ওটা লেখা হয়েছিল তিরানব্বইয়ে, আর *সুতোর গান* পঁচানব্বইয়ে। তুমি যে *সুফি-সন্ত-বাউল*-এর কথা বলছ, ওটা আরও পরে লেখা— ছিয়ানব্বই নাগাদ, সুধীরবাবুর (চক্রবর্তী) *ধ্রুবপদ*-এর জন্য, বেরোয় তার পরের বছর। মুশকিল হচ্ছে, আমার অন্য বইগুলোয় যেমন রচনাকালের উল্লেখ আছে, তৃতীয়টার ক্ষেত্রে তা না থাকায় তুমি তোমার মতো করেই ভেবেছ নানারকম মিলিয়ে, তুমি তো আটানব্বইয়ে পাচ্ছ *খণ্ডিত শ্লোকের দিনে*। তার আগে কবীর সংক্রান্ত প্রথম বইটাও বেরিয়ে গেছে পঁচানব্বইয়ে। আজনবি-হাসিনার সঙ্গে সন্ত বা সুফিচর্চার কোনো যোগ ছিল না, বা তার বীজও ওতে ছিল না, নির্দ্বিধায় বলতে পারি। একটু অন্যরকম কিছু লিখতে চেয়েই যা হয়েছে, মুক্তছন্দে... বরং সেদিক থেকে কবীর সংক্রান্ত বিষয়-আশয় নাড়াচাড়া করার দরুন, বাউল-ফকিরদের গানের টেক্সটও সামান্য কিছু— সবটাই কাজের সূত্রে, তার একটা রেশ *সুতোর গান*-এ এসেছিল, এইটুকুই যা। বলতে পারো, সেই প্রথম পয়ারও নয়, মহাপয়ারও নয়, তার মাঝামাঝি, মিলছাড়া একটা প্রবহমান ছন্দে ওই সিরিজটা হয়ে উঠেছিল। লিখে ভালোও লেগেছিল। আজনবি-হাসিনায় তো এবড়োখেবড়ো, কখনো ছোটো কখনো বড়ো— এলোমেলোভাবে পঙ্‌ক্তিগুলো, সেরকমটাও জরুরি ছিল, নিজের কাছেই। সেটাও লিখতে তখন ভালোই লেগেছিল। ওরকমই হচ্ছিল, ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো হয়েই সব আসছিল। কিন্তু *সুতোর গান*-এ অন্য ধাঁচেই... তবে তার সঙ্গেও কোনো রহস্যবাদী কাল্টচর্চার বিশেষ যোগাযোগ নেই, বা সুফিদেরও। আমাদের ইনার সোল যখন যেমন কথা বলতে চায়, কবিতার ভাষাও তো সেইমতো হয়ে ওঠে, তাই কি না? আর একটা কথা কী জান, নির্দিষ্ট মাপে বা ছাঁচে আমাদের আধুনিকতা— কবিতাজগতেরই— খুব ক্লান্ত করে। সেখান থেকে একটু অন্যরকম, স্বাদ বা আর যা-ই বলো, পেতে কার না ইচ্ছে করে। নিজের জন্যই সেটা, অন্তত প্রাথমিকভাবে। আর দ্যাখো, যে লিখছে, তার যেমন একটা রিনুয়াল দরকার, যে পড়ছে— তারও তো সেটা চাই। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে সবটাই একতরফা। পাঠকেরও তো একটা প্রস্তুতি দরকার, তার দিক থেকে স্ট্যাগনান্ট থাকবে, আর যে লিখছে তারই যত দায়— এভাবে কতদিন চলে! ফলে যা হবার সেটাই হচ্ছে।



সে তো অবশ্যই। আচ্ছা, কবীর, সুফি আর *কলকাতার রঙ্গিণীকথা*— এদের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে?

এ মা! এ কী প্রশ্ন! *কলকাতার রঙ্গিণীকথা* আসলে *প্রতিক্ষণ*-এর শারদীয় সংখ্যার জন্য লেখা। দেবেশদা (রায়) চেয়েছিলেন, সাবেক কলকাতা নিয়ে হোক, বা কিছু-একটা এমন লিখি যা বেরোতে পারে। তখন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর* পত্রিকার বিচ্ছিন্ন কয়েকটা কপি হাতে এসেছিল। আমাদের বন্ধু অতীন ভট্টাচার্যর সংগ্রহ থেকে। পড়েছিলাম। তখনও কিন্তু ওই পত্রিকা বই হয়ে বেরোয়নি। নব্বই দশকের গোড়ার দিককার কথা। লোকে হাতেও পায়নি সেসব। সে যা হোক, কয়েক পাতা

লিখেটিখে যা খাড়া হয়েছিল, শারদীয়তে বেরোয়। যুধাজিৎদা ইলাসট্রেশন করেছিলেন— কালীঘাটের পটের মতো করে। বেশ দেখতে হয়েছিল। নামটা দেবেশদারই দেওয়া। আমি তো কোনো শিরোনাম ভেবে উঠতে পারছিলাম না। পরে চুরানব্বইয়ে যখন মোনোগ্রাফ হল, *প্রতিক্ষণ*-এর 'লম্বু' সিরিজ বলতাম আমরা, আকারের জন্যই, তখন বাড়াতে হল, আনুষঙ্গিক আরও কিছু যোগ করে কনটেম্পোরারি করারও চেষ্টা হল সেই পিরিয়ড পিসকে। এই আর কী। ওর পরের বছর *কবীর ও তাঁর কবিতা* ওখান থেকেই বেরোয়। একানব্বইয়ে পত্রিকায় যা বেরিয়েছিল, তার চেয়ে আরও বেশি অনুবাদ যোগ করে, নতুন করে গদ্য পোর্শন, টীকা ইত্যাদি লিখতে হয়। দুটোর মধ্যে যোগসূত্র তো সেই পত্রিকা আর তার প্রকাশনা— এর বাইরে তো আর কিছু থাকার কথাও নয়।

***চন্দ্ররেখার সনেট*-এ তুমি বাংলা চতুর্দশপদীর চেনা কাঠামোকে ভাঙতে চাইলে কেন? এই বইতেই তুমি সনেত্তো কাউদাতো বা টেইল্ড সনেটও লিখেছ। এই লুপ্ত ফর্মটাকেই-বা কেন উদ্ধার করতে চাইলে? এর সঙ্গে আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে— বার বার কিছু লুপ্তপ্রায় ফর্মকে তুমি কবিতায় ফিরিয়ে আনো— পান্তুম, ভিলানেল ইত্যাদি। এই রিভাইভালটা কি রাজনৈতিক? সচেতন?**

এর ভেতর আবার রাজনীতি এল কোত্থেকে? কোথাও কি কোনো নিষেধ আছে, যে, ওগুলো আর লেখা যাবে না? আমার তো জানা নেই। আর বার বারই-বা কোথায়? একটা সময় সাবেক ওয়েস্টার্ন ফর্মগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল আমায়, তার কারণও ছিল। শুধু ওয়েস্ট নয়, আমাদের ইস্টেরও কিছু জিনিসে— যেমন গজল, রুবাই এগুলোর দিকেও। সনেট পশ্চিম পেয়েছে কোত্থেকে? কী করে গড়ে উঠল? সেই ইতিহাসটা তো জানতে হয়েছে। আর তখনই, গজল আর রুবাই— এই দুটোর কী ভূমিকা ছিল আরবদের স্পেন-বিজয়ের হাত ধরে, সেসবও জানা গেল। গজলের প্যাটার্নটা শুধু গালিব অনুবাদের ক্ষেত্রেই নয়, নুসরত ফতেহ্ আলির কওয়ালি শুনে আপ্লুত যখন, ওঁর স্মরণে একটা লেখাতেও তা এসেছিল। তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে সেই *মেহফিল-এ-সমা* লেখাটার কথা। আবার সতেরো শতকের সর্মদের রুবাই যখন অনুবাদ করেছি আমার কাজের সূত্রেই, সেটা অবশ্য আজও প্রকাশ পায়নি, তখনও তো জানতে হয়েছে বিষয়গুলো। *চন্দ্ররেখার সনেট*-এ একটা লেখাতেও, নাম মনে পড়ছে না, যেটা আমাদের পুরোনো বন্ধু সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলাম, সেই রুবাই আর গজলকেই নির্দ্বিধায় এনেছিলাম। অনুবাদ আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে। কবীরের ক্ষেত্রেও, শুধু দোহা তো নয়, আমাদের এই দেশেরই কত বিচিত্র প্যাটার্ন ছিল কবিতার, সেসবও কিছুটা জানা হয়েছিল। হাতে-কলমে না করলে তো বোঝার উপায় নেই এক-একটার ইনট্রিকেট ব্যাপারস্যাপার। ছিল তো গান— সব ক-টাই। সেখান থেকে যখন রিটন অবস্থায় আসছে, কীভাবে বদলাচ্ছে, সেটা বুঝতে গিয়ে দেখি রিফ্রেইন বা ধুয়োরও বৈচিত্র্য রয়েছে। এই যে *বোধশব্দ*-র জন্য তুমি এতসব প্রশ্ন করছ, ওরই পুরোনো সংখ্যায় একটা সেসটিনা-ও লিখেছিলাম। নতুন সংখ্যার জন্য একটা রঁদো ধরনের লেখাও দিয়েছি। আবার ওই ধরনটাই কিন্তু রঁদো-র একমাত্র নয়। তার বাইরেও আছে। কিন্তু এগুলো লিখব বলে আগে থেকে পণ করে তো লেখা যায় না। তা ছাড়া, ওই যে তুমি রিভাইভ করার কথা বললে, ওসবও আমার লক্ষ্য নয়। নিজের লেখাটা যেভাবে লিখলে নিজে স্বচ্ছন্দ থাকি, সেখান থেকেই লিখি। কোনোটাই আমার কাছে ফেলে দেওয়ার বিষয় নয়। ভেবে দ্যাখো, বঙ্কিম সেই কবে 'গদ্যপ্রবন্ধ' বলে প্রস্তাব করেছিলেন, পদ্যর বিপরীতে আরেক ধরনের এক্সপ্রেশনের জন্য। কেউ তাকিয়েছি সেদিকে? আমরা সেই পশ্চিমের দিকেই চেয়ে রইলাম প্যারাগ্রাফের মতো কবিতার আরেকটা প্যাটার্নের জন্য। যেহেতু আমরা সংস্কৃতে গোমূর্খ, আমাদের কোনো কিছু এসেও যায় না সেদিকে তাকানোর ব্যাপারে, অথচ সেখানেও ছিল ওই জিনিস। র‍্যাঁবোর চিঠি দেখো, একটায় জানাচ্ছেন, উনি কিছু গল্প লিখছেন— আসলে *সিজন ইন হেল*-এর লেখাগুলো শুরু হয়েছে তখন, উনি জানাচ্ছেন স্টোরি বা গল্প, খুব ইন্টারেস্টিং। গদ্যকবিতা যে এই পাত-পাত লেখা হচ্ছে, সেখানে আবিষ্কার কোথায়? আমরা মিউজিকটাকে যদি হারিয়ে ফেলি ভাষার ভেতরকার, কী হয় তাহলে, সে তো দেখাই যাচ্ছে। আমার ভেতরে যদি মিউজিক, রিদ্‌ম, ডান্স, এগুলোর কোনো ভূমিকা থাকে, আমার এক্সপ্রেশনও তো বদলাবে তাহলে। তুমি যে ওই চতুর্দশপদীর চেনা কাঠামোটা ভাঙার কথা বলছিলে... আমি কিন্তু কিছু ভাঙতে চাইনি, গড়তে চেয়েছিলাম, সামান্য অন্যরকমভাবে... ওই যে তোমায় তৃতীয় বইটার *সুতোর গান* প্রসঙ্গে বলছিলাম— পয়ারও নয়, মহাপয়ারও নয়, মাঝামাঝি একটা প্রবহমান ছন্দ, *চন্দ্ররেখার সনেট*-এ সেটাই এসেছিল আকস্মিকভাবে, বহু বছর পর, আমায় বিশেষ কিছু করতে হয়নি, সহজভাবেই এসেছিল, হয়ে উঠেছিল ওভাবেই, তাতে কোনোই অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। ছন্দে তো আমি কখনো হাঁসফাঁস করিনি, কোনো-একটা কাঠামোতেও নয়। পুরোনো বাড়িঘরদোরে যেমন অনেক শরিক থাকে-না, এও সেরকম। আমার অংশে কেবল অদলবদল হয়েছে, সামান্যই... পলেস্তারা, রং যা নতুন লেগেছে, সেটা আমার মনোমতো। এটুকুই বলার, এর বেশি কিছু বলার শক্তি আমার নেই।

তাও যা বললে, না খোঁচালে বলতে কি?

তোমরাও পুরোনো হয়ে গেলে, আমার মতোই, তাই বললাম।

আচ্ছা, তুমি কি বিমূর্ততাকে প্রশ্রয় দাও?

কবিতাটা লিখতে চাইলে, কেউ কি তা এড়িয়ে থাকতে পারে? এ নিয়ে আর বাক্যব্যয় করিয়ো না, অনেক হয়েছে।

ঠিক আছে। বহুদিন তুমি কবিতা প্রকাশ থেকে দূরে। লিখছ না, না কি ছাপছ না?

এমনিতে বরাবরই কম লিখি। বায়ুরোগ ধরলে তখন যা হয় আর কী। প্রকাশ তো হয়, হয় না একেবারে তা নয়। শেষ, বোধ হয়, *অনুষ্টুপ*-এ বেরিয়েছিল, হ্যাঁ সেও হয়তো বছর চারেক আগে। নানারকম ঝামেলায় কনসেন্ট্রেশনের অভাব হয়... জোর করে কোনোসময়ই তো লিখিনি... আসলে ফেঁসে গেছি বিচিত্র সব দায়ে... পাস্টেরনাকের কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলাম— সেও তারপর খুব বেশি এগোতে পারলাম না ঝামেলায়। পড়ে আছে অনেক লেখা, সেসব নিয়ে হয়তো দু-তিনেক বইও হতে পারত। মোটের ওপর সব প্রিন্টেডই ছিল। সেও তো পড়েই থাকে...

তা করো, একটু উদ্যোগ নাও।

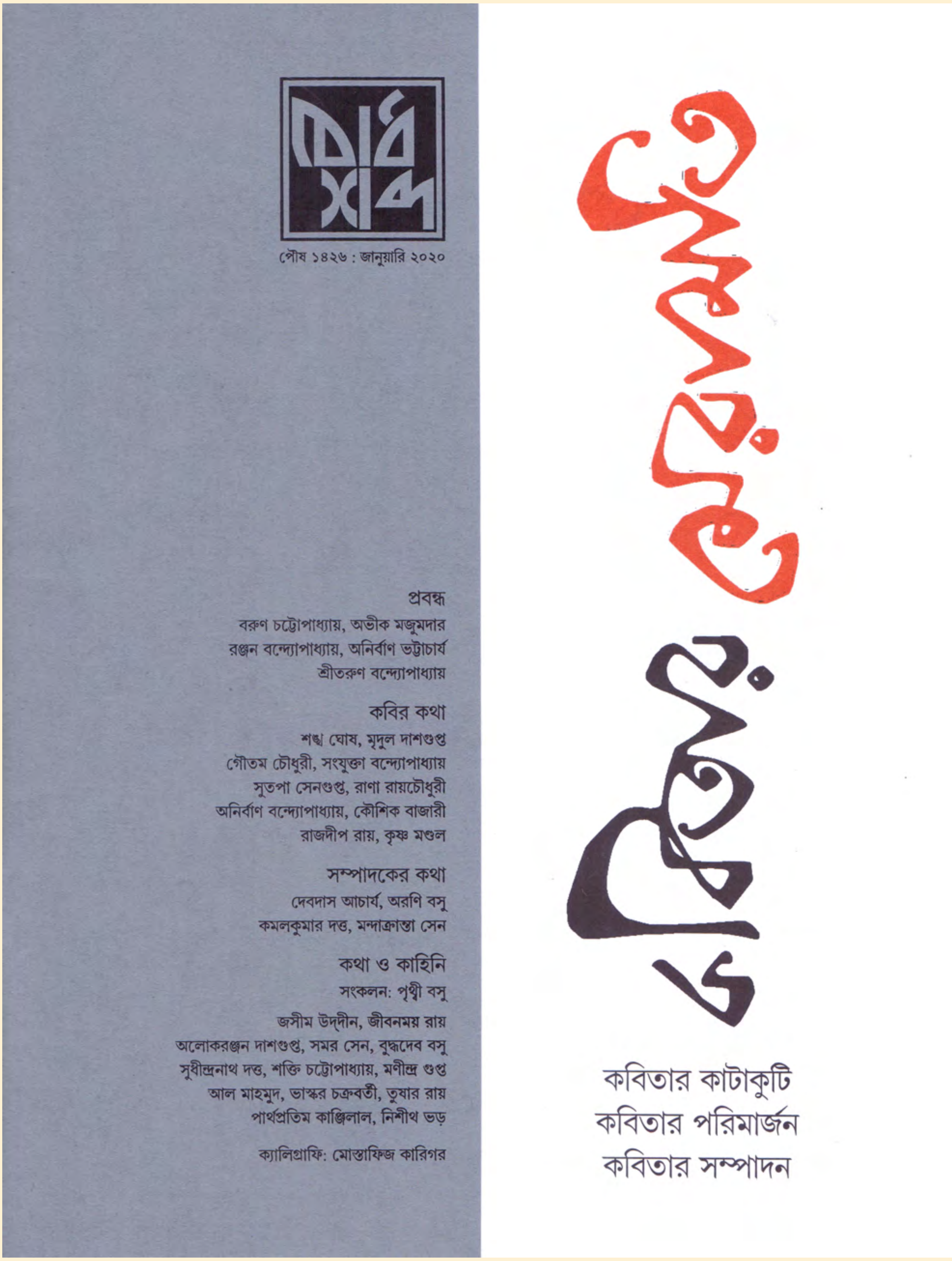
দেখি, কী করা যায়...

আমার শেষ প্রশ্ন...

এখনও?

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে বাংলা কবিতার গঠন, তার ভাষাগত স্থিতিটা কেমন?

কী বলি, বলো তো! স্ট্রাকচারাল বলতে চাইছ নিশ্চয়। কেয়ারলেস, অধিকাংশই। যেন কিছু এসে যায় না। আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই— ডি এল রায়ের সেই গানটা মনে আছে, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গলায়? ওটার কথাই মনে হয় বার বার। কোথাও যেন রুট নেই। সার্চ কম। ভেবে দেখার অবকাশ নেই। চটজলদি একটা-কিছু। নড়বড়ে সবমিলিয়ে। হয়তো নার্ভাসও। সবাই তো আমরা একটা অদ্ভুত সময়ের ভেতর দিয়েই যাচ্ছি। যাদের হবার, ঠিকই হবে। সে তো গুটিকতক। সেটা সবসময়ই। ভাষার সঙ্গে লড়াই করেই তো বাঁচে তারা। আর কী বলা যায়!



বোধশব্দ
পৌষ ১৪২৬ : জানুয়ারি ২০২০
প্রবন্ধ
বরুণ চট্টোপাধ্যায়, অভীক মজুমদার
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য
শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবির কথা
শঙ্খ ঘোষ, মৃদুল দাশগুপ্ত
গৌতম চৌধুরী, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুতপা সেনগুপ্ত, রাণা রায়চৌধুরী
অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক বাজারী
রাজদীপ রায়, কৃষ্ণ মণ্ডল
সম্পাদকের কথা
দেবদাস আচার্য, অরণি বসু
কমলকুমার দত্ত, মন্দাক্রান্তা সেন
কথা ও কাহিনি
সংকলন: পৃথ্বী বসু
জসীম উদ্দীন, জীবনময় রায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র গুপ্ত
আল মাহমুদ, ভাস্কর চক্রবর্তী, তুষার রায়
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়
ক্যালিগ্রাফি: মোস্তাফিজ কারিগর
কবিতার কাটাকুটি
কবিতার পরিমার্জন
কবিতার সম্পাদন



তন্ময় মৃধা

কাগজ ও ক্যানভাস— এই দু-এর সামনেই জীবনের কঠিনতম ও সবচেয়ে ফলদায়ক মুহূর্তগুলি কাটিয়েছেন তন্ময় মৃধা (জ. ১৯৬৭)। তিনি কবি, শিল্পীও। পেশাও তাঁর আর্ট কলেজের অধ্যাপনা। এ-পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই : *হাওয়া বাড়ি* (১৯৯৬), *পরিধি* (১৯৯৯), *মেধাবী নির্জন* (২০০১) ও *ব্যাচেলারস জোকস* (২০১০)। সম্মানিত হয়েছেন অনন্য রায় পুরস্কারে (২০০০)। ছবির জন্যও পেয়েছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার।

আশির দশকের শেষদিকে কবিতা লিখতে এসে যে বিজ্ঞাপন-শাসিত সময়ের মুখোমুখি হলেন তিনি, তা-ই হয়ে উঠল তাঁর কবিতার শরীর, কবিতার আত্মা। তাই ঠারেঠোরে নয়, ঘনীভূত রহস্যের আস্তরণে নয়, বরং সোজাসাপটা এক গদ্য-চলন তাঁর বিষাদ ও বিদ্রূপকে একইসঙ্গে মূর্ত করে তুলল। কবিতায় আপাত তুচ্ছ বা সাম্প্রতিক বিষয়কেও তুলে এনে যেন আদপে তন্ময় তাঁর হারিয়ে যাওয়া 'আমি'-কেই খুঁজতে চেয়েছেন বার বার। পাঠক তাঁর সহযাত্রী হয়েছে।

নতুন কবিতা

তোর কথা

থেকে থেকে মনে হচ্ছে তুই কথা বলছিস, যেন
তোর কথা শুনতে পাচ্ছি আমি।
মনে হচ্ছে তুই বার বার বলছিস আমার কাছে আসার কথা।
যখন তখন। দিনক্ষণ সুবিধে-অসুবিধে
কিছুই তো বুঝতে চাস না। মনে হচ্ছে ঠিক যেন
আমার গায়ে লেপটে শুয়ে আছিস তুই,
পাশ ফিরে না কি আমার দিকে মুখ করে।
কীরকম অদ্ভুত টাইপের তোর গোল মতো মুখটা,
ঠিক গোলও নয়। চুল খোলা। চোখ দুটোও যেন কেমন—
বড়ো বড়ো, টানা টানা, অপূর্ব কোনোটা না।
কাটা কাটা শক্ত খুব ভালো দুটো ভুরুর উপরে
মাঝে মাঝেই আঙুল বোলাচ্ছি আমি।
মাঝে মাঝে তুই বলছিস— পিততা একতু তিপে দে না—
তুই যেমন বলিস।

এক গ্রীষ্মশেষের সামুদ্রিক গরম হাওয়ায়
ভেসে এসেছিলি তুই, আরেক গ্রীষ্মে তুই চলে গেলি—
দূরে চলে গেলি— অথচ একটা মধ্যবয়স্ক মানুষ আমি—
তুই যে নেই, তুই যে নেই আমি বুঝতেও পারছি না।

মনে হচ্ছে তোর কথা শুনতে পাচ্ছি আমি—
কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না তুই আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস।

তোর পছন্দ করা চায়ের কাপগুলো
তোর সাধের শীতলপাটি, আমাদের কলেজ ট্যুরে তোর
বেনারস বেড়াবার অ্যালবাম, তোর ফোন নাম্বার,
তোর দেওয়া থার্মোমিটার, আর হাবিজাবি জামাকাপড়গুলো
নেই অবশ্য। তোর দুধ-সাদা খাবার প্লেটের কোলে
কী সুন্দর আঁকা আছে একতোড়া নীল রঙের ফুল। আর
তুই ফেলে গেলি তোর একান্ত নিজস্ব সম্বোধন— ‘তুই’।
আমার মতো গুরুজনকেও তুই ‘তুই’ ডাকিস শুনে আমি,
আমার বৃদ্ধ মা-বাবা, আমার ভাই সবাই খুব অবাক হয়েছিল।

কিন্তু তুই আমাকে ছেড়ে গেছিস—
এ-কথা তো আমি মাকে বলতে পারব না। বললেও
বোঝাতে পারব না। তোর মা-র মতো আমার মাও তো
তাই জানে— তুই আমার মেয়ের মতন।

সারা বাজার ঘুরে তোর পছন্দের
মাছ কিনে আনতাম আমি, মুখে তুলে খাইয়ে দিতাম।
স্নানের পর আমি যদি চুল মুছিয়ে না দিতাম,
বিছানা-বালিশ, আমার টি-শার্ট সব ভিজিয়ে একশা করতিস।
ছোট্টো অনাথ একটা সিংহশাবকের মতো
ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াতিস আমার ঘরে।
দু-একবার দাঁত-নখও বসিয়ে দিয়েছিস আমার বুকে-পিঠে।
সিংহশাবকের অনাচার আমি যথাবিধি মানিয়ে নিয়েছি।

আমার স্নানের মধ্যে, আমার খাওয়ার মধ্যে
আমার শোয়ায় তোর অবাঞ্ছিত অনুপস্থিতি
যেন কোনো নিঃশব্দ নিক্বণ—
অনেক অপূর্ব যত্ন, অনেক অপূর্ব ভালোবাসা
অনেক আদর আর অন্ধকারে ছুটে চলা মেঘের ভিতরে
তোকে খুঁজতে গিয়ে ভিজে আসে চোখ
দেখি আলোর গহ্বর— হাওয়ায় টলমল করছে
দূরে দূরে মানুষের ঘর। তবু তুই জেনে রাখ
তোকেই চেয়েছি আমি শতরূপে, তোকেই চেয়েছি শতবার।

তোমার কথা

১

বারোটা নিষ্ক্রিয় তুলি
মিসাইলের মতো পর পর সাজানো আছে মগে
তার নীচে পড়ে আছে ফুলশিট কার্ট্রিজ পেপার যেন
মিসাইল উৎক্ষেপণের জন্য নির্মিত চাতাল।
কার জন্য লেখা হবে, আঁকা হবে?
আগামী পৃথিবী কোনো রূপ রস রেখা বা শব্দের জন্য
এতটুকু আত্মীয়তা অনুভব করবে না।
মৃত্যু শুধু মৃত্যুই একমাত্র সত্য
আর এই জীবন স্রেফ আকস্মিক ঘটনা— অ্যাক্সিডেন্ট,
ভাই বলে, দাদা বলে, বাবা-মা বলে এখানে একটা গল্প
চালু আছে ঠিকই যদিও গল্পটার কোনো মানে নেই।
কত উঁচু-নিচু জমির কথা তোমার জানা ছিল
কত রকমের আবহাওয়া দেখেছ তুমি
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আড়ষ্ট হয়ে গেছ
গরমে তুমি নিজে চোখে পাক ধরতে দেখেছ আমে
কোথা থেকে ধেয়ে আসা ঝড়ের দাপটে দুলতে দেখেছ নারকেল গাছ।
শীতের নীরবতা আর শরতের উজ্জ্বলতার মধ্যে তুমি আর
লুকোতে পারবে না।
তোমার মা নেই, কোনো ঘর কোনো আশ্রয় নেই তোমার
তুমি আসলে নিরাশ্রয় একটা গৃহপালিত পশু
অনন্ত সময় ধরে পার্থিবতাকে সহ্য করা ছাড়া
কোনো দ্বিতীয় বিকল্পের কথা তোমার জানা নেই।

২

তুমি বুঝতে পারোনি কী থেকে কী ঘটতে চলেছে
নদী ও নৌকো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ
আউলা মেঠো পথে তোমার পা আর পড়বে না
জল পুকুরের তল পাবে না, আকাশের নীচে বাতাসের বুকে
প্রকৃতিপুত্রের অবাধ বিচরণ এখন প্রস্তরভাষ্য
ধানগোলায় আগুন লেগেছে। বাঁধাকপি খেত ফুলকপি খেত
টমেটো বাগান মটরশুঁটি বাগান সব খাঁ-খাঁ শূন্য
গোয়ালে গরু নেই, খড় নেই, কুটো নেই,
শুধু রাজপথের বন্যা আর বন্যার মতো রাজপথ রয়েছে।

৩

জীবন নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া হয়েছে
বিছানাপত্তর থেকে জানলা-দরজা
ঝুলঝাড়ু থেকে প্রেসার কুকার
জীবনের দীর্ঘ মালা গাঁথা হল দীর্ঘদিন ধরে
সেই হাতে ধরে রাস্তা পেরোনোর দিন
সেই চিবুক ধরে চুল আঁচড়ে দেবার দিন
মায়ের আঁচল ধরে অষ্টমী পুজোর মণ্ডপে যাবার দিন
বাস্তবিক স্পন্দনহীনতার কথা জানা ছিল না তোমার,
জানা সম্ভবও ছিল না।
একদিন যে তুমি ঘরবাড়ির চেয়েও একটু বড়ো হয়ে যাবে
সেদিন কেউ বলেনি তোমাকে।

৪

সকাল থেকে সাজিয়ে তুলেছ বাঁচা,
যেন তুমি রাজমিস্তিরি। হালকা ঠান্ডার মধ্যে ধীরে ধীরে
গেঁথে তুলছ কত বাসনার বসবাস।
জলে হাত, চায়ে ঠোঁট, খোলা দরজার হিমেল হাওয়া
স্পর্শের শুদ্ধতা জানিয়ে শুরু করতে চাইছে একটা দিন।
একটা দিন, গোটা একটা দিন— সাংঘাতিক দীর্ঘ একটা দিন।

গোধূলির কবিতা

একদিন তোমাকে কামনা করেছিলাম— তখন—
অনেককাল আগে। এখন—
তেমন দুপুরগুলো নোকরি করে থাকি।

বিকেলের দিকে তুমি ইদানীং মাঝে-মধ্যে
নুন খেতে চলে আস পরিত্যক্ত
বিট অফিসের কাছাকাছি

তোমার জিভের তাপে নুন গলে গেলে
বিরক্ত কঙ্কণ শব্দ হয়।
অসংগত অনুরাগ অসমাপ্ত দু-টি চোখে
অনুযোগ হয়ে ছায়া করে

কবেকার কল্পনদী কবেকার কল্পতৃষ্ণা
মেটাতে পারে না।
তুমি নতমুখে ফেরো শ্রাবণ গোধূলি
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোঝে তৃণাঞ্চলে
বিন্দু বিন্দু অনর্থক নুন ঝরে আছে।

পূর্বপ্রকাশিত

খনন-ধুলোলিপি

ঈর্ষণীয় বৃষ্টির মধ্যে
দিবাভাগ হিম করে শুয়ে আছি
ঘড়ি ও ঘণ্টার মতো সচেতন
নির্ভুল ভাবতে পারি কী করে ঘামের থেকে
এঁদো এঁদো নির্বিকার গন্ধ উঠে আসে
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই এক সত্যকার বিষ।
প্রকৃত সহোদর ছাড়া এইখানে বাঁচাও কঠিন
মা ও বাবার মতো কেউ কেউ খণ্ডে ক্ষণে নমস্য
ছড়িয়ে আছে মন্দ লাগে না
তবু সেই মেয়েটির কষ্ট সমুদয়
অনূদিত হবার মতো সাহস রাখে না।
আমিও মূর্খের মতো কীসব চরিতামৃত লিখি
অলীক একার সামনে এরা কেউ প্রতিপক্ষ নয়।
প্রেমের প্রসঙ্গে এই কুৎসা ও কুপ্রচার সুখীদের বিরত করুক
ওসব জন্মের সাথে ধুলো ও রক্তের মতো
আমার ভূমিষ্ঠক্ষণ জরায়ুমথিত ব্যথা এবং
প্রসন্ন বন্যায় শস্যহানি মড়া ও মড়ক
বাতাস হাতড়ে কোনো আগন্তুক গাছ আমাদের
শ্রদ্ধেয় বিদ্যাপীঠ ভেঙেটেঙে উঠে যাবে— অতঃপর
আরো কোনো কোনো স্বপ্নে বৃক্ষকে প্রসন্ন দেখেছি
প্রসন্ন হয়েও তবু ঝড় ও ঝঞ্ঝার মতো কিছু কিছু সমীহও থাকে
বৃত্ত নেই— কোনো বৃত্ত নেই, আমাকে নিরাবৃত
অবহেলা দিলে জননীর গুরুতর কষ্টবোধ হবে
আমার মৃত্যুতে কোনো শোকদিন পালিত হবেই
এই সত্য কেউই জানে না।
প্রকৃত রৌদ্রের ছবি আঁকো
প্রকৃত ছায়ার জন্যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখো দেখি
প্রকৃত কিছুর জন্যে প্রকৃত কিছুই তুমি সদর্থে পার না
আমার সংশয় পর্ব প্রহরা মানেনি
আমার রোমন্থন কালে কপটতা পূজ্যপাদ নয়
তবু আমি মিথ্যাচারে বেঁধে দিই সত্য ও সংশয়
নিরঙ্কুশ মিথ্যাচারে জয়ের সম্ভাব্যতা ভেবে
ব্যক্তিগত প্রশাসনে আবহ গড়ার মতো কিছু
প্রত্যুৎপন্ন বাঁচার বাহানা পেলে খুশি হই
আশ্চর্য অথচ দেখি সে বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসেনি
আগ্রাসী বালির ন্যায় চরাচর কুতাপে কাতর
আমি সেই বিষণ্ণ ব্যাপ্তির পানে দেখি
উহাদের ঘোরতর অভিশাপ আমার ললাট ঘিরে সান্নিধ্যপ্রত্যাশী
জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের কোন ছবি মৃত্যু দিতে পারে
শ্মশান তো ধোঁয়ার সঞ্চয় এবং বার্তাহীন বন্ধুদের
উলঙ্গ স্বপ্নের প্রান্তে হরিধ্বনি গাঁজা ও চরস
শ্মশান ও শবের সাথে সেইসব যাপনের আহামরি প্রভেদ দেখি না
অথচ বাঁচার নামে ঘ্রাণ ও দৃষ্টির কাছে দায়বদ্ধ
দল বা বর্ণের মতো শূন্যগর্ভ অবস্থানে প্রদর্শনী চক্রাবর্তে
ছবিগুলো ধুলো হলে মূল্যমান বিচারেও শিল্পীর কান্না পেতে পারে
এবং গ্রীষ্মারম্ভে সুপুষ্ট হাওয়ায় আমি হাত রেখে
অবিশ্বাসে কাঁদতে পারি না।
খননে বেআব্রু বালি— কাঁড়ি কাঁড়ি
বৃক্ষটির পত্রে বৃন্তে পিপাসা বাড়ায়
জলের সান্নিধ্যে এলে ট্যারা-বাঁকা প্রতিচ্ছবি
হি-হি হেসে ওঠে— আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, একই শব্দ
প্রত্যন্ত কেন্দ্র অবধি।
ওইসব যূথবদ্ধ অন্ধকার ভেঙেচুরে
কোন প্রভা অচঞ্চল আছ, ওইসব অবশ
গহ্বর ঘিরে কোন দ্যুতি নৃত্যে দোলাচল
ওরে ও দোদুল্যমান প্রভা তুমি এই যাপনের অভিসারে এসো।
কোন দিকে নদী আছে— প্রবাহিত জনতা জানে না
কোন দিকে অঙ্গীকার— সমুদ্রের এত নীল—
নীলিমার উৎস এই যুবকেরা খোঁজেনি খোঁজেনি
জন্ম ও জীবনের সাথে সার্থকতা, অর্থ ইত্যাদির
অনর্থক যোগসূত্র গড়ে দিতে প্রয়াসী হয়েও তবু
ধুলো ও ধুলোই সম্বল।
এবারে স্রোতের কাছে এসো—
এখন আলোর কাছে প্রার্থনা করে না
নারীকে ফিরিয়ে দাও— বলে দাও সম্ভাবনা দেব না দেব না
ভালোবাসা ফিরে যাও— অশ্রু এই কাঙালের মাধুর্য বিরোধী
এবারে স্রোতের কাছে এসো—
এখন মূলের কাছে অন্ধকারে নেমে এসে
শিয়রে দাঁড়াও, প্রতিটি শিরার কাছে
প্রতিটি রক্তের মানে বুঝে— প্রতিটি স্পন্দনে
এই জীবনের ঋণ কতখানি, প্রতিটি দৃষ্টির কাছে
মূলত স্রোতের কোনো অর্থ আছে কি না
এই চুলচেরা হিসেবের প্রান্তদেশে— অন্ত্যজ ভালোবাসা
কতখানি হীন— আমি তোমাকে বোঝাব॥

হাওয়া বাড়ি

আর একটা শীতকাল এল
আপাত মানুষজন তাতিয়ে গুছিয়ে নিল শিরদাঁড়া
গুনে গুনে মেলে ধরল মড়মড়ে রোদ্দুরে
কর্মফলহীন এক তাসের দুপুর
বিচ্ছিন্ন হাওয়ায় এই হাওয়া বাড়ি
কক্ষে— কোষে— রুগ্ন ভাস্কর্যে
কত টুকটাক খেলা গড়ল বাতাস শিশুরা
ভেঙে গড়ল কৃষিমাঠ— ধর্মাধর্ম— যুদ্ধযুদ্ধ খেলা
ইটের পাঁজর থেকে অলৌকিক সামান্য সবুজ
ব্যালকনি ডিঙিয়ে সেই জারজ গুল্মেরা
ঝাঁপ দিয়ে ঢুকে পড়ল প্রকৃত কঙ্কালে
আর্ত-নীলাভ তবু সেই কিছু ফুল
ফুল বল— ভালোবাসা বল— দিল তো সত্যিই
দীর্ঘ আচ্ছন্ন এই হাওয়া বাড়ি—
ঘিরে নিল নিরুত্তাপ কুয়াশার জট॥

প্রণাম

এই সেই মধ্য দিন। আমার আক্ষেপ আর অসন্তোষ নগরায়নের মতো দ্রুত বেড়ে ওঠে। এমন একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি— হাত বাড়ালেই ঝনঝন করে বেজে উঠছে তার, দুদিকে ধোপাদের কাচাকাচি আর সাবানের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে বোকা মফস্বল। আজ রবিবার গা-গতর রগড়াবার দিন। ফলত স্নানঘাট আবালবৃদ্ধের ভিড়ে সেজবৌদি, তার আলুর খোসার মতো রক্তশূন্য স্তন আর বেআব্রু পায়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। বাড়ির বড়রা আজ তাস এমনকী পানও ছোঁবে না। কেবল পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খোঁচাবে। তাদের খাওয়া দাওয়া হল সারা, ভরা পেট খাঁজ পড়া, মোটা ও ফাঁপা—

এদিকেই ছুটে এল বাচ্চারা কথা ছিল সেরকমই কিন্তু লজ্জা পেল সকলেই। আর একপুকুর জল সেজবৌদির বুকে পিঠে পোষা বিড়ালের মতো লেজ বোলাচ্ছে দেখে সকলে বাঁ-হাতে শক্ত করে চেপে ধরল প্যান্টের গিঁট। আমি পরিষ্কার দেখলাম তারা বৌদিকে প্রণাম করে ফিরে গেল॥

পরিপূরক

পৃথিবী তোলপাড় করে খুঁজে আনব
আর একটা মানুষ— তার সাহায্যের হাতে
গড়ে উঠবে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে
আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ,
জনযুদ্ধের ডাক পড়লে সেই যাবে—
সেই আনবে বাগান থেকে স্থলপদ্মে
সে সাজাবে অন্ন ব্যঞ্জন, কবিতার
জটিল অংশগুলি সেই লিখবে—
জনান্তিকে যে কোনো মেয়েকে গিয়ে
বলে আসবে বাঁকাচোরা কথা,
মরমী বন্ধুর কাছে মরমী বন্ধুর নামে
তদ্গত ভাষায় ঐশ্বরিক ঝামেলা বাঁধাবে—
অভাবে অন্যের কাছে হাত পেতে চেয়ে আনবে দশ-বিশ—
কেউ এলে যত্ন-আত্তি—
কেউ এলে— প্রত্যুদ্গমন—
সুপাত্রে হাসতে হাসতে পাত্র বুঝে দুর্ব্যবহার—
এমনই প্রত্যুৎপন্ন— এমনই ভাবের ঘোরে চুরি
ডুবে ডুবে কত রকমের কত জল খাবে—
নিমিত্তের মতো এই কর্মকাণ্ডে আমি থাকব নির্জন—
বিষণ্ণ আর ভাবে আর্দ্র— পাদদেশে টীকার মতন॥

বৃত্ত

১

সাত কী আটই জানুয়ারি হবে
একজন মৃত মানুষ বিকেলবেলা
পয়সা গুনছিল—
বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল নগণ্য
আর বলাই বাহুল্য তাপমাত্রা ছিল পাঁচেরও নিচে
হিম আর হীনমন্যতা যেন জীবনে ঘোচে না
এই বহুমুখী দুস্থতার দশা।
মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে আমারো অবসন্ন লাগে
মনে হয় কূর্মঅবতার এই প্রতিষ্ঠার পিঠে চেপে
একদিন সন্তোষপুর যাই—
দেড়কাঠা নিচু জমি আর সুশ্রী শিক্ষিতা
পাঁচ ফুট দুই-এর একটা মেয়ে দেখে আসি।

২

চলো না আমার সঙ্গে চলো—
এই পর্যটনে পুণ্য হবে, অভিজ্ঞতা হবে—
আর যার নাম সুবর্ণ সুযোগ, তা কখনো
হেলায় হারায়?
ওই যে দণ্ডায়মান বাড়ি—
ওই যে দণ্ডায়মান বাড়ি— আরো বাড়ি— আরো বাড়ি
সবুজ মানেই বৃক্ষ, নয় লতা, নয় গুল্ম
আর শায়িত রাস্তার ধারে যা কিছু তাকে অবস্থিত বলে—
গিরিখাত, গিরিশৃঙ্গ, বৃষ্টিপাত, মরুভূমি—
এইসব প্রবাদ প্রবচন আমি বাদ দিচ্ছি
কিন্তু মানুষের কথা না লেখা অন্যায়
যাকে আমরা ঋতু বলি—
আসলে তো স্বপ্ন থেকে উঠে আসে—
শীত কী বসন্ত বলো— ওরা সব স্বপ্ন থেকে আসে
মানুষ খুব নিরাপদ আর নিরীহ
একবার জন্মায় আর সাত-আটবার মরে॥

পরিধি

১

উত্তুরে হাওয়ায় আমরা মানিয়ে গিয়েছি। দারিদ্র্যসীমার নিচে
যাদের দেখা যায়— আমরা তাদের মতো রাজা নই, ঝুড়ি
হাতড়ে শাকটা সব্জিটা, শূন্য থেকে রোদ, রোদ থেকে
অপার আনন্দ— এসব আমরা বানাতে শিখেছি।
অনেকদিন যাবৎই আমি প্রতিভাবান— কাজেই উপলব্ধির ব্যাপারে
আমি স্পর্শকাতর। পৃথিবীর প্রচুর বিষয়ে চুলচেরা জানি—
সব জানি— প্রায় সব জানি— এই— যেমন ধরো— কোনটা বলব—
ধরো সাইকেল— দ্বিচক্রযান— শিখে নিলে চালানো কিচ্ছু না;
ধরো ভ্রমণ— খরচবহুল আনন্দ— সবার নিচে বাবা, বাবার
কাঁধে মা, মায়ের কাঁধে মেয়ে, বাবার পায়ে ভূভাগ
আর মেয়ের মাথায় মেঘ, আবার এই মেঘ নিয়ে
আমাদের ভূগোল বই-এ এক লাইন কবিতা ছিল—
শরৎকালের মেঘ পেঁজা তুলার মতো। এবার বলি যারা
হারিয়ে যায় তাদের কথা। সরকারি হিসেবে এদের
পঞ্চাশ শতকরাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব— তবে
খুঁজতে গিয়ে হারাবার নজিরই বেশি। আর
হারিয়ে যাওয়া মানুষের রঙ কষ কালো— ঠোঁটে তিল—
কপালের কাটা দাগ চেনা যায় না— এত কালো।

২

ছোট্টো একটা খাটিয়ায় আমি শুয়ে আছি
আর আমার ওপর শুয়ে আছে
মহাকবিতার সংকল্প।
আমি একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করি—
এই বৃষ্টির বিকেলটা বাদ দিয়ে, তুমি আর একদিন এসো না—
অন্য একটা রৌদ্রের বা অন্য কোনো আলোকলগনে—
ও আমাকে চিনতে পারল
এবং তারপর যা হয়—
গণ্ডমূর্খ লেখার খাতায়— দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে
মিশে গেল বিখ্যাত বাতাসে।

৩

এমন একটা সময় আমি কাটাচ্ছি— যখন
প্রতি দু লাইন অন্তর আমাকে অন্তত একবার
আকাশ লিখতে হচ্ছে—
আকাশ যেখানে আমাকে নিয়ে চিন্তিত নয়
ফালতু আমি কেন আকাশ নিয়ে ভাবতে যাব
আর আমি আকাশ লিখব না,
কার্যত শেষবার লিখছি— আকাশ— আকাশ।

৪

অন্ধকারে কলম চালিয়ে অ লেখা যায়
আমি লেখা যায় না, আমি লেখা যায়
আমার লেখা যায় না,
কিছুতেই লেখা যায় না আমার।

৫

ঘরবাড়ি তৈরির সময় কিছু না কিছু শব্দ হবেই
ঘর বাড়ি তৈরির পরও তাই
ঘর বাড়ি যখন ধ্বংস হয় তখনো কিছু শব্দ হয়
এবং ঘরবাড়ি ধ্বংসের পরও চুকে যায় না—
স্তব্ধ হয় না— শব্দ হয়—
শব্দ হতেই থাকে।

৬

পৃথিবী গোল—
একজন অন্ধের তরফে এই হল চূড়ান্ত বিবৃতি
আর আমিও শুনেছি— বিকেলের দিকে
একটি অন্তর্মুখী গাছ নাকি বাতাসের কাছে
বিকিয়ে দেয় নিজেকে—
অবশ্য দেখিনি কখনো।

২৩

কত কত বয়স হয়ে যাচ্ছে আমার
ফুটো জানলা— ফাটা জানলা
মেঝেতে রোদ্দুর পড়ছে—
আন্তর্জাতিক এক্জিবিশনে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া
গ্রাফিক্স-এর মতো দারুণ রোদ্দুর—
ওল্টানো একটা গামলার উপরে বসে
আমি তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলাম,
মনে হচ্ছে হাজারো মানুষ
তাদের সহস্র বয়স নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে
একটা শক্ত নিরেট সরলরেখার উপরে
মহাশূন্যের মধ্যে মাথা গলিয়ে
তারা গুনগুন করে কথা বলছে—
বলছে— এসব আমরা চাইনি
বলছে— এসবের মানে কী
যে লোকটা আমাদের পাড়ায় ফুলের টব বিক্রি করতে আসে
তাকে আমি খুলে বলেছি সবকিছু—
বলেছি— তোমার পেশাটা সুন্দর—
আমার আগামী দিনের পরিকল্পনার কথা,
একটা হলুদ গোলাপ লাগাবার
আন্তরিক ইচ্ছার কথা,
সেই গোলাপ ফুটলে আমার কেমন লাগবে
অথবা না ফুটলে আমি কীভাবে নেব
সবই বলেছি তাকে
আমি তাকে বলেছি— পৃথিবীর সব দেশেই
মাস্টারের ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,
পৃথিবীর সমস্ত মাস্টারের ছেলেদের মেধা
দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে,
একভাগে তারা ধরে আছে বিন্যাস
অন্যভাগে স্প্যাস্টিক গহ্বর—
আমি আমার ছোড়দিকে বলেছি— ছোড়দি—
আমাকে একটা সেলাই তুলে দিবি—
একটা হাঁস আর একটা ফ্রক পরা মেয়ে
একটা হাঁস আর একটা ফ্রক পরা মেয়ে।

মেধাবী নির্জন

ছোটোখাটো যান্ত্রিক ছায়ার বাইরে পা রাখতেই
এ গলিটা মোড় নিলো, শীতের রাত্তির, যত দূরের ল্যাম্পপোস্ট
ততবেশি দুঃখের ভিতরে ওরা আবছাতর;
বহুবার আমি লিখতে চেষ্টা করেছি নির্মীয়মাণ বাড়ির কথা
বহুবার আমি উল্লেখ করতে চেয়েছি ওই কাঠের ল্যাম্পপোস্ট
টুকরো আলোর বৃত্তে উদ্ভাসিত জাইলেম-ফ্লোয়েম।
কখনো বলছি না আমি নতুন নতুন বাড়ি তৈরির ভিতর
কোনো আশার আলো আছে, আমি কখনো বলছি না
কাঠের ল্যাম্পপোস্ট দেখলেই আমার
ফিওদর দস্তয়েভ্স্কির কথা, বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কথা
মনে পড়ে যায় বরং এ কথাই বোঝাতে চাইছি
যে লোকটা বাড়ি বানানোর কাজে হাত দিয়েছে
সে এখন চেতনার শীর্ষে বিরাজিত।

সাদা রঙের দানব— আমাকে ক্লান্ত কোর না।
আমিও পারি নিঃস্ব ভূমিতল থেকে শুষে আনতে সাদা বিষ।
ওগো অস্বচ্ছ তরল— আমার প্রতিকৃতিকে তুমি
অন্ধ করে তুল না, অচেনা গর্ভের দিকে হ্যাংলার মতো
তোমার গড়িয়ে যাওয়া দেখে মনে হয় যেন
কোথাও কোনো জাদুসিঁড়ি তার চাঁদরঙের
ইন্দ্রজাল নিয়ে বোবা নীলিমার মধ্যে ঝুঁকে নেই,
মনে হয়, বন্ধুকে বন্ধু বলার সময় কারো চোয়ালের গায়ে
ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছা হচ্ছে না আস্ত একটা চেয়ার।
বই পড়ে পড়ে কবিতা লেখায় উন্নতি করা যায় না
আমি জানি— ত্রিপর্ণ গোলাপ পাতা— নোংরা লোক
তোমাকে আঘাত করলে তুমি বাতাসের শরণ নাও—
একমাত্র বাতাসের সান্নিধ্যেই তুমি শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো।

জাদুসিঁড়ির উপর হন্যে হয়ে পায়চারি করছে আনিল কাপুর—
গাইছে— এক লেড়কি কো দেখা তো অ্যায়সা লাগা—
আর এক ধাপে মিঠুন, ক্যাঁক্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে
আন্নু মালিককে জিগ্যেস করছে— তিসরা কোন্—
আর ঘাড় নিচু করে উড়ে আসছে একটা ঈগল—
তার বনসাই চুল— প্যারালাল প্যান্ট—
পেটে লাথি মারলেও বলতে পারবে না
ভালোবাসা কারে কর, বরং তুমি মনে করতে পারো
আটার পেসিমিস্ট সেইসব বাংলা গান—
যা রেডিয়ো থেকে আমাদের জনমানসে
বিরাট বিরাট আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসতো,
রুচির প্রশ্ন উঠলে তুমি ঝুঁকে পড়তে পারো
হাতপালিশে চকচকে বীণায় আর সতত কম্পনশীল
তারের উপরে কোনো গীতিকার ভিখারীর তামার আঙ্গুলে
তুমি গুঁজে দিতে পারো তোমার হাত;
লোহার রিং-এর মধ্যে পা আর মাথা গলিয়ে তুমি
প্রণাম করতে পারো ভিড়াক্রান্ত তুম্ লোগ-এর
মুখ লক্ষ করে, তুমি সাবধান করতে পারো—
দাদা দেখবেন— এ কামরায় পকেটমার আছে।

রিং-এর মধ্যে ওই পা আর মাথা হ'ল
একাধারে শাস্তি ও সান্ত্বনা। ওই পা—
এমন জায়গায় ফেলছে আর ওই মাথা—
মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে এমন সব বিপদ রচনা করছে
যা চোখ চেয়ে দেখার মতন।

কেমন সেই বিপদ—
ধান ক্ষেতের কাঁচা সবুজের উপরে
অনবরত পেচ্ছাপ করে দেবার প্রবণতা,
সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে বিরাট একটা বাতাসের
নোংরা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্যে টাকা ধার করা,
ঝাউ গাছকে এল গ্রেকো বলে ডাক দেবার ধাষ্টামো,
মেয়ে দেখলেই কুকুরের মতো মেউ মেউ করা,
বাবাকে আজীবন বাবা বলে ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
সত্যজিৎ রায়কে কিছুতেই ভুলতে না পারা,
সরকারি নির্যাতন নিয়ে মন্তব্য করার ঐকান্তিক ইচ্ছা,
সাদা সাদা প্রেক্ষাপটকে নোংরা করে দিয়ে
তার সামনে হরগোবিন্দ্ খুরানার মত দাঁড়িয়ে থাকা,
শোকতাপ-গ্রহনক্ষেত্র-ঘরবাড়ি-দুর্গাপুর সিমেন্ট বা
হোমি ভাবা নিয়ে আমার ভাবনাকে
কেউ খাটো করে দেখলে তাকে নির্বোধ ভাবা—
এইরকম অজস্র বিপদ—

তবে হ্যাঁ— উত্তর যখন লিখতে হয়
তখন অবশ্য আমি ঠিকঠাক লিখি— যথা—
অত্যাচারী জমিদার শিবচরণ বাবু ডেকে পাঠালেন
এবং গফুরের বেলায় যথারীতি এলো, খেলো বা
জাহান্নামে গেলো এবং আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি
কোথাও কোনো কারণে আমাদের চোখের পাতা
ভিজে উঠতে লজ্জা বোধ করে, আমরা লক্ষ করি
কোথাও কোনো কারণে আমাদের চোখের পাতা
ভিজে উঠতে লজ্জা বোধ করে, আমরা লক্ষ করি
ভগবান আমাদের ঠোঁট থেকে হাসি উঠিয়ে নিচ্ছেন
আঙ্গুল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছেন স্পর্শ— আমাদের
ঠেলে দিচ্ছেন দূরে— কোণে— কাচের জানলায়।

এসব না, আমি বরং লিখে ফেলি সেই ছেলেটার কথা
যাকে পাশের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল
ছোট্টো একটা খবর দিতে, যার সম্পর্কে বলা হয়—
এই তো, এখানেই খেলছিল— একমাত্র সন্ধ্যাই তাকে
খুঁজে আনবে নীলাভ বন্ধনে, বরং আমি উস্কে দিই
সেইসব নুড়ি পাথরকে যাদের সম্পর্কে আমরা
আশা পোষণ করি বরং আমি সমর্থন করি ফাল্গুন নিবাসী
কোনো দূরবর্তী মানুষের দূরবর্তী সন্ধ্যার সংলাপ।

সারাটা দুপুর আমি বেঁচে থাকি দূর দূরান্তর থেকে
ভেসে আসা শব্দের ভিতরে, মৃদু-শান্ত শব্দের ভিতরে
আমার মাথার ভিতরে খাঁ খাঁ করতে থাকে

ছাতা ভিজানো গরম কালের মাঠ— মাঠের পর মাঠ
রৌদ্র যেখানে জাল বোনে, সূর্যের সোনার সূত্রে
বাতাসের হাতে বোনা জাল, আত্মীয় অনাত্মীয়
প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত, শব্দ ও নিঃশব্দের মধ্যে
আমি কোনো কণ্ঠস্বরের আভাস পাই না।

আজ অপরাহ্ন থেকে একটা বড়োসড়ো ছেঁড়া কাগজ
আমার কুটিরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে
একটা ছেঁড়া কাগজ আর-একটা ছেঁড়া কাগজকে
দূরে ফেলে দিয়ে আসতে পারে না তাই তখন থেকে
আরো দীর্ঘক্ষণের জন্যে ও সৃষ্টি করে চলেছে মুমূর্ষু একটা সুর।

আজ অপরাহ্ন থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে
একটা মালগাড়ি, মেটুলী রঙের এই মালগাড়ির গায়ে
কবিতা লেখা আছে, লেখা আছে বিস্মৃতির লুকোচুরি খেলা—
শান্তি উদ্রেককারী প্রহরের দীর্ঘ প্রতারণা।

নয়ানজুলির মধ্যে আকাশের তারা
একটা বর্ণহীন আবেদনপত্র নিয়ে তির তির করে
কাঁপতে থাকে, রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে
আলো নিবিয়ে মাছেরা চলে যায় শ্যাওলার মেরুন জাজিমে
উপেক্ষিত হতে থাকে তারাটি— কেন না আকাশ
তার সহায় সম্পদ নিয়ে পাড়ি দেয় পুবের দেশে
স্বজন হারানো কোনো জন্তুর মতো আমিও তখন
মাথা তুলে ধরি বাতাসের অন্তর্নিহিত ঠান্ডার ভিতরে
আমিও অনুভব করি— টালত মোর ঘর—
নাহি পড়িবেষী— নেই নেই, নেই নেই বলে
একটা প্রেমের গান লিখতে শুরু করে
অন্ধকারের গাছ আর আমি তাকে শব্দ জুগিয়ে যাই—
উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জার মালী—
গাছের সুরে আর আমার কথায় বাতাস তখন
স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে শুরু করেছে।
এদিকে ততদিনে তোমার নরম কণ্ঠস্বরকে আমি
ছড়িয়ে দিয়েছি আবহাওয়ার কেশরাশির ভিতরে
তারা উকুন হয়ে কিরকম দিন কাটাচ্ছে আমি জানি না—
একটা কালসিটে পড়া বিস্মৃতির স্পর্শের ভিতরে
আমি হারিয়ে ফেলেছি কোনো সাদা রঙের ফুল
আর তোমার দুলে দুলে কথা বলার উপরে
আমি স্থাপন করেছি তোমার উপচে পড়া অশ্রু
আর আমার হাভাতে ঠোঁটকে আমি লেলিয়ে দিয়েছি
সেই অশ্রুর নিষিক্ত দূরত্বের দিকে— এখন আমি
ধাওয়া করে চলেছি একটা সোনা রঙের বুদবুদ লক্ষ করে।

এবং শেষ পর্যন্ত নৈঃশব্দ্য আমাদের গ্রাস করে ফেলে
নিঃসঙ্গতা আমার চোখের সামনে এবং কানের দুপাশে
আমি তাকে স্পর্শ করি না তবু দীর্ঘক্ষণ সে
সাড়ে সাতটা হয়ে পৃথিবীতে স্থির থাকে— দীর্ঘদিন ধরে সে
টেবিল ল্যাম্পের উপরে ধুলো, শায়িত কলমের
কিনার ঘেঁসে ছায়া আর নিথর বালিশে
কারো শোবার ধরনটুকু ধরে রাখে
আমারি কায়দা কানুন— আমারি ভালোবাসা
আজ আমি যোগ্য কারুর হাতে দিয়ে যেতে চাই
আমার প্রথম কবিতার বই, আমি দিনের পর দিন
এঁকে চলেছি একটা শুকনো পাতা, তার মৃত শিরা
মৃত কোষ, মৃত বাতাসের কোনো মৃত প্রেক্ষাপটে
তার মৃত্যু আবৃত্তির গূঢ় সুর।

হাজার হাজার দিন আমি তোমার চিঠি পাই না
বহুদূর থেকে আমি আদল দেবার চেষ্টা করি
তোমার ছিন্ন অপেক্ষমান ভাষার অগ্রন্থিত ব্যাকুলতাকে
তোমাদের একতলা বাড়ির একটা ছবি এঁকে রাখি মনে মনে
তোমার বাবাকে আমি মনে করি একজন
উচ্চপদস্থ কেরানি যার ঘামে ভিজে কাঁধের উপরে
আমি সযত্নে পাট পাট করে রাখি একটা সরু চেকের রুমাল
তোমার মা একটু মোটার দিকে, তিনি ভালোও না মন্দও না
আর তোমাদের কোণের ঘরের সেই অবিবাহিত মাস্টারমশাইকে
আমি ক্ষমা করে দিয়েছি— তার রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিলো
আমারই চেহারার মতো সন্দিগ্ধ— যাই হোক, আমি স্বপ্নেও
তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না— বিধাতা তোমার
কণ্ঠায় যখন ফুটিয়ে তোলেন ফোঁটা ফোঁটা মণিমুক্তো
আর সেই বহুচারী বাতাসের কাছে যখন অর্পণ করো
তোমার উচ্ছৃঙ্খল পেলবতা— এই যে শোনো— বহু যুগের
ওপার থেকে আমি পাগল হয়ে উঠি— ঠিক তখনই একদিন
দুপুরে এই পৃথিবীতে মরুনিশ্বাসের প্রচলন হয়
ভাঙা জুড়িগাড়ির অক্ষ থেকে ছড়িয়ে পড়তে চায় তার
পরমায়ু আর তক্ষুনি তক্ষুনি আমাদের যেটা জানা দরকার
তা হ'ল অনেক অনেক প্রৌঢ়া মিলে তবে একজন প্রৌঢ়া
এবং অনেক অনেক রোদ্দুর মিলে তবে রোদ্দুরের সৃষ্টি হয়।

কি করা যাবে বলুন— বিষণ্নতা এমনি একটা অসুখ
যা কারো কারো হয় কারো কারো হয় না
বাতাসবাহিত এর জীবাণু তামাম দুনিয়ার
তামাম বস্তুতে বিরাজিত শুধু ধারণ করবার মতো
হৃদয় চাই— বিশেষ প্রযুক্তিসম্ভূত ঢালু ও মসৃণ
মস্তিষ্ক গড়ন, স্মৃতি সেই পরিতলে আসতে পায়—
থাকতে পায় না, পিছলে গড়িয়ে পড়ে ভূপৃষ্ঠের
দারুণ নির্জন কোনো বেলাভূমির প্রাগৈতিহাসিক নীলিমার ভিতর।

এসব না—
বরং আমি সূত্রায়িত করে ফেলতে পারি কিছু কিছু
জ্ঞাতব্য বিষয় : যেমন কোনো বাংলাদেশি ছেলেকে
আপনি কবিতা শোনালে সে তার মাথাকে
শরীর থেকে সামনে নিয়ে আসে এবং
ক্রমাগত দোলাতে থাকে বাতাসে।

যখন সবুজ রঙের কার্যকরী দিক নিয়ে আপনি
গভীর কোনো বিবৃতি দিচ্ছেন তখন লক্ষ করবেন
কেউ কোথাও নেই শুধু কার্নিসের উপরে সযত্নে রাখা আছে
কোনো স্কুলশিক্ষিকার দুটি কালো চোখ।

প্রান্তর আর কালভার্টের কয়েক গজের মধ্যে
যদি কোনো মৃদুভাষী বাবলা গাছ থেকে থাকে তো
ওখানে আপনাকে বার বার যেতে হবে কেননা
পৃথিবীতে ওটুকু জায়গাই সম্ভাবনায় ঝিকমিক করছে।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়— যেটুকু জানার
আমি জেনে নিয়েছি— জানা হয়ে গেছে আমার
কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, সম্ভব নয়— কারণ
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে
পুব থেকে পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার ঐ যুগান্তকারী
নোংরামি সহ্য করার মতো ধৈর্য ছিল না আমার
আর আমি পায়চারি করতে করতে লক্ষ করে নিয়েছি
পেঁপে পাতার ছায়া— আমি কুলকুচি করে দিয়েছি
কম্পমান ছায়ার উপরে— তাতে অবশ্য ছায়াদের
কিছু ছেঁড়া যায় না— কারণ ছায়ারা জানে—
অ্যাম্ফিথিয়েটার কিংবা সোদপুর যেখানেই তুমি
হাঁটো না কেন মেঝে থেকে উৎসারিত হবে
এক ধরনের গুঞ্জন— আর এই শব্দ থেকে
রেহাই নেই আমাদের, শব্দের প্রতি মমতায়
আমরা রাতের পর রাত জেগে থাকতে পারি—
জীবনের এই স্পন্দনকে একদিন লাঠি পেটা করতে করতে
যখন সমুদ্র পারে পৌঁছাব নিশ্চয়ই দেখতে পাব
রাত কাবার হয়ে আসার এক নীল শব্দে ঘুম ভাঙছে
জলরাশির— তাদের ঘুমভাঙার শব্দে আলতো
আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল বাতাস— কুহেলির
স্থির সব শব্দরাশি সরিয়ে সরিয়ে— এক একটা মিনতি মাখা
ঝাউ গাছকে ফেলে রেখে— মিহি সুতোর মাইল মাইল
জাল আর নতুন আলকাতরা করা ট্রলার সরিয়ে
বাতাস চল্লো— ভোর ভোর তাকে পৌঁছে যেতে হবে
অন্যত্র— সেখানে কোনো প্যাগান দেবতার নির্বোধ
চরণ ছোঁয়া মাত্রই জেগে উঠবে স্পন্দন।

আমার নায়ক তখন বিড়বিড় করল— চাঁদ এখনো
আকাশ পেরুতে পারল না আর এরি মধ্যে ফিকে হয়ে যাচ্ছে
চারপাশ, অনেক সময় আমাদের অনেক চিন্তাই
বিজ্ঞানভিত্তিক হয় না, তাই বলে আকাশ পেরুবার
সময়টুকু অন্তত দেওয়া উচিত চাঁদকে।
আজ আমার নায়ক যদি ভিজে ঘাসে পা রাখে
তো তক্ষুনি তক্ষুনি তার জামার রং হয়ে যায় লাল
আর একটা পাল তোলা জরির নৌকো ভেসে ওঠে
তার অকিঞ্চিতকর বুকপকেটের বুক ঘেঁসে।

এক এক দিন বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় দক্ষিণের
কোনো উঁচু উপত্যকার বাঁজা ভূখণ্ডে— কিন্তু কেন—
আমাকে নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে—
এসব কি কথা— আমি বলছি অনুসরণ করার জন্যে
আমাকে এই অশেষ পথের ধুলায় ধুলায় রেখে যেতে হবে
পাপড়ির পর পাপড়ি— কি ফুলের পাপড়ি— কেমন রং—
কিছুই এখনো ভাবা হয়নি আমার— এখন আমি যাব না বাতাস—
কি ভাব কি আমাকে— পাতা? ঝরা পাতা? পরিষ্কার করে
না বল্লে আমি তো নিশ্চিত হতে পারছি না যে
কেউ আমাকে ঘৃণা করে, তাছাড়া আজকাল আমি
স্বপ্নের মতো ক্ষিপ্রতায় লিখে যাচ্ছি একটার পর একটা
অকপট চিঠি, খুব তাড়াতাড়ি আমি সেগুলো আমার
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের ঠিকানায় পাঠাতে শুরু করব
আর তারাও আমাকে ভোলেনি— এই তো সেদিন—
ব্রাত্য আমাকে একটা ক্যাসেট প্রেজেন্ট করলো—
আখিল্লেস না ইউরিপিদেস কার একটা নগ্ন সুঠাম ছবি—
চাপা কিন্তু উজ্জ্বল হলুদ রঙে আঁকা— আমি
জিগ্যেস করলাম অডিও না ভিডিও— আর এই
কালকেই তো পাহাড় থেকে বেড়িয়ে ফিরেছে ভাই—
একদম সস্তায় দুটো চেক শার্ট এনেছে—
পাটপাট ইস্তিরি করা— দুর্ধর্ষ কালার— ওর আর
আমার জন্যে; মা বাবার জন্যে— দাদার জন্যে কিছুই আনেনি
তবু শার্টের সুবাসে আর ওরকম কম দাম শুনে আমি
বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, জিগ্যেস করলাম— ওখানে
বেশ ঠান্ডা না। না না, সামনেই আমার সুদিন আসছে—
আমি এখন যাব না বাতাস—
জেগে থাকলে আমাকে ওরকমই লাগে।

কি করলে আমাকে কিরকম লাগে—
লাথি মারলে বা চড় মারলে বা অন্য কোনোভাবে
আঘাত করলে আমাকে কিরকম লাগে— সে কথা লেখার জন্যে
আমি দোয়াত খুলে বসিনি, তোমাদের মতো উদ্দেশ্যহীন
ভবঘুরেদের আমি করুণা করি, আমার কাজ আছে
শতেক সংকল্প আছে, এই যেমন কিছু দিন হ'ল
স্বাভাবিক শয়ন আমার অসহ্য ঠেকছে, আমি এখন
চেষ্টা করছি দেওয়ালে পিঠ রেখে ঘুমাতে
বাধ্যবাধকতার ব্যাপার না, এটা আমি স্বেচ্ছায়
বরণ করে নিয়েছি, পরিভাষায় একে কৃচ্ছ্রসাধন বলে।

আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা দীর্ঘ হবে না।
তবু ভোলা যায় না— দিব্যোন্মাদ চৈতন্য চলেছেন— তাঁর
মৃদুল ধুতির প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করছে নীলাচলের সফেন
তরঙ্গরাশি আর তাঁর রক্তচরণের ছাপ আমরা
মিলিয়ে যেতে দেখেছি দূরে; আমরা দেখেছি লংশটে
কন্যাকুমারিকার মন্দির আর প্রস্তর খণ্ডের উপরে
দণ্ডায়মান উত্তমকুমারের মতো বিবেকানন্দ আর
রামপ্রসাদ বানতেছে বেড়া— মন বেড়া ধরে দাঁড়ায়ে আছে
আদ্যাশক্তি মহামায়া— মন মনরে আমার—
অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, চরাচরে কাজের লোকের অভাব নাই,
মন দিয়া ভালোবাসলে নাকি তাঁর সাক্ষাৎ মেলে, নাকি
পরপার দেখা যায়, আজ আমি লেখনীর অন্তস্তলে
একটি গরীব প্রজাপতি এঁকে রাখলাম, আজ আমি
স্পর্শ করতে চাইলাম এমন একটা কিছু যাকে আমার
স্পর্শ করা সাজে না। তো এই হ'ল আমার সেই কবিতা
বুঝলেন— আচ্ছা আমাকে কি কেউ বুঝিয়ে সুঝিয়ে

ভালোপথে ফিরিয়ে আনতে পারে না—
লোকজন তো কত কিছু করছে—
বিসিএস পাচ্ছে— কোয়ালিফাই করছে— স্লেট-নেট
এমনকি অনেক ছেলেরা মেয়েদের বিয়ে করছে—
লোকে শান্তি পাচ্ছে— নাট্য প্রযোজনা করছে— হাসছে—
স্বাভাবিক স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে—
সিন্ডলার্স লিস্ট দেখছে— শুধু আমার পেছনে চিউইংগামটা
লাগালো কে— আমারই কোনো শান্তি নাই কেন—
অবশ্য ভারি ভারি দাগলা দাগলা অসভ্য অভিজাত
হবার থেকে আমার এই ভালো, ওই শুরু হ'ল আবার
নিজেকে ভালো বলা— আরে লোকে যারে ভালো বলে
সেই ভালো হয়, আমি ভালো নই, আমি বাদে সবাই ভালো,
শমীন্দ্র ভালো, বাবলা ভালো, অনুরাধা ভালো, অদ্রীশ ভালো
মৌ ভালো, আচ্ছা একটা কথা— ব্যক্তিগত কথা কবিতায়
ব্রাত্য— হ্যাঁ ব্রাত্য ভালো। তাই আমি বাদে আর সবাই
যে ভালো এই সারসত্যটুকু বোঝাবার জন্যে
এই স্থলে খেজুর গাছের উল্লেখ করলাম, আমি
উল্লেখ করলাম সেই সমস্ত খেজুর গাছদের যারা
পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায়, পৃথিবীতে লেখাটা ঠিক হ'ল না—
যাই হোক, যারা বিভিন্ন জায়গায় উজবুকের মতো
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ধরনের মনোবেদনা সৃষ্টি করে
না না মনোবেদনা না— একটা আনন্দোদ্ভেব খণ্বিমানি
ভূতানি অর্থাৎ একটা ভূতের মতো, একটা আনন্দের মতো
হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর আনন্দ করতে করতে
একটা ট্রেন চিরজীবনের মতো মাঠ পেরিয়ে যায়;
মহানন্দে আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকি, মরি মরি—
তুমি এ কী কাণ্ড করলে জল— ওগো জল— ঘোলাজল—
তুমিও আনন্দে মেতে জগদীশপুরের খেয়ে, কালভার্ট
ডিঙিয়ে, চম্পাহাটির কুড়াতে চল্লে, পারলে কী করে তুমি
অবশ্য তুমি তো বর্ষার জল— রবি ঠাকুরের বংশধর
তোমার আনন্দ ঠেকায় কে।
এসব দেখে শুনে আজ আমারো পালে হাওয়া লাগলো
আজ আমারো মনে হল মানবজীবন মানে এক ধরনের আনন্দ
মানুষের অন্তরে আনন্দ ভিন্ন অন্য বস্তুর স্থান নাই
আনন্দে বৃষ্টি পড়ছে— মাটি হচ্ছে আনন্দে আকুল—
আনন্দে বকুল ফুটছে— বকুলের আনন্দ মালিকা—
তোমার আনন্দ কণ্ঠে পরাব কি আনন্দ বালিকা।

বাচ্চারা নাচিতে নাচিতে ইসকুলে যাচ্ছে
স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হয়ে কী করছে
কী করে জানব, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের আনন্দ বিধানের জন্যে
বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন এগিয়ে আসছে
হিন্দুরা আনন্দে মুসলমানদের জড়িয়ে ধরছে
ইহুদি আর জার্মানরা আনন্দে ফেটে পড়ছে
রুশ আর কাজাকস্তানের মধ্যে আনন্দচুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে
অফিস কাছারিতে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তো খালি আনন্দ
ব্যাঙ্কে, কলামন্দিরে, দেবালয়ে, মসজিদে, ইউনিভার্সিটি
ক্যাম্পাসে— এককথায় সর্বভূতে আনন্দ বিরাজিত;

অর্থাৎ প্রাণীবাচক পদার্থরা জন্মের সাথে সাথেই
আনন্দের কোলে ঢ'লে পড়ছে আর সেই আনন্দের প্রতিচ্ছায়ায়
ঝলমল করে উঠছে নিষ্প্রাণ পদার্থ সমূহ।
ওগো জগৎ জোড়া বৃষ্টির মেঘ—
আজ আমি তোমাকে তুলে দিলাম কিছুটা উপরে—
মাটি থেকে মমতার দূরত্বে— দূরে দূরে তুমি
বিছিয়ে দাও তোমার দীর্ঘ চুম্বনের মতো আলো।

তোমাদের ব্যাপারটা আমি বুঝি—
তোমাদের কাছে পণ্ডিচেরিও সত্য স্যাটেলাইটও সত্য
যে কিনা ঈশ্বর আবিষ্কার করেছিল সে নিশ্চয়ই
বুঝতে পেরেছিল কী জিনিস সে আবিষ্কার করে গেল
আকার আয়তনহীন এই আবিষ্কারটি তোমাদের
যে পরিমাণ কাজে এসেছে অন্য কোনো কিছু তোমাদের
না হলেও চলতো তবু আরো কিছু কিছু আবিষ্কার
তোমাদেরকে বিস্ময়কর করে তুলেছে— যেমন
কোন কোন বিষয়ের সংস্পর্শে হাসি পাবে বা
কীরকম পরিস্থিতি কান্নার উদ্রেক করে— এই দুটি
আবিষ্কারকে আমি শ্রদ্ধা করি, আমি প্রণতি জানাই সেই
বিতর্কিত বিজ্ঞানীকে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন ভালোবাসা
ওই মাথার উপরে আকাশ কি চলার পথে কোনো
হালকা বেগুনি রঙের ফুলগাছ, অফিস ফেরতা
কোনো কেরানির মৃত বাজারের ব্যাগ থেকে
মুখ বাড়িয়ে থাকা বেলফুলের লাজুক চারা অথবা
স্নানের সময় যাকে তোমার মনে পড়ল অথচ
যাকে তুমি ভুলে গেলে জলের মতো সহজে—
এইসব অঙ্গীকার তাঁরি তুলি থেকে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে
বাতাসে, তবু নাটক শুরুর আগে কিছুক্ষণ অন্তত
ঘসা কাঁচের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত
দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে আলো অন্ধকার সাঁতরে
পচে উঠতে পারে তোমার চোখের কাজল
গুলির জায়গায় গুলি হ'ল কিন্তু গানের জায়গায়
গান হ'ল না— কেউ তোমার করমর্দন করতে গিয়েও
করল না কেননা তোমার সমস্ত হাতে লেগে ছিল অভ্রকুচি
আর তোমার খোঁপার অন্তরে কোনো গোলাপ ছোঁয়াতেই
মুহূর্তে নেতিয়ে পড়লো ঘুমে কেননা গোটা খোঁপাটাই
ছিল নকল। তবু বৃষ্টির মেঘ—
তুমি ক্ষমা করে দিও আমাদের— দূরে দূরে তুমি
বিছিয়ে দিও তোমার দীর্ঘ চুম্বনের মতো আলো।

তোমাদের উদ্ভাবনী শক্তির এক ঘৃণ্য ফসল হ'ল খিদে
আমি অবাক হয়ে যাই যখন দেখি সত্যি খিদে পাচ্ছে
আর তখন আমি আবিষ্কার করি একটা টিফিনবক্স—
ভিতরে চারখণ্ড শশা, দু-খণ্ড আপেল, চারপিস
বাটার ল্যাপটানো স্লাইস আর একটা সন্দেশ
কোনো কোনো দিন আমি আবিষ্কার করি
কুচি পাথর নিয়ে অন্তত পঁচিশ রকমের চাল, আমি
আবিষ্কার করি শ্রীমানী মার্কেট, লেকমার্কেট, হাট বাজার
আর ঐ প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চারজনেরই পছন্দ

অজন্তা হাওয়াই, কি একশ জনের মধ্যে নব্বই জন
যখন ঠনঠনে কালীবাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে
আধা সামরিক কায়দায় স্যালুট করতে থাকে তখন
মতাদর্শগত পর্যালোচনায় না গিয়ে আমি বরং
আবিষ্কার করে ফেলি আমার ঘরে ফেরার রাস্তা
রাস্তা ব্যাপারটা এমনই আবিষ্কৃত হ'ত কিন্তু
ঘর যে আবিষ্কার করেছিল সে কি লিখে যায়নি
কি জন্যে ওটা আবিষ্কৃত হয়েছিল— জানলা, দরজা, সিঁড়ি নিয়ে
গোটা একটা ভাস্কর্য— ওটা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে
ঢুকে শোবার জন্যে নয়— এই সাদা কথাটা আমাদের
বোঝা উচিত কেননা আবাসন প্রকল্পের মতো রোদ্দুর
যখন ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে পাড়ায় পাড়ায়— এক একটা
বাড়ির মধ্যে তখন বিরাট বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়—
আমি দেখেছি— মা তার বাচ্চাকে সনাক্ত করতে পারছে না
জানলা দিয়ে বাবা ভেসে যাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে আর
একটা অতিকায় লুডোর উপরে অজ্ঞান হয়ে আছে
খুব বৃদ্ধা কেউ হবে— তবু আজই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না
যে, কেউ কাউকে ভালোবাসে না কেননা
অপেক্ষা করার মধ্যে কিছুটা গ্লানি থাকলেও
মাধুর্যও থাকে। আমি বরং চলন্ত বাসের চোয়ালে সেঁটে দিই—
কাজ মিটে যাবার পরও আমি আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকি
শ্যামবাজারে— চারাগাছ ঘেরা সানের উপরে বসে
আস্ত একটা আতা ছাড়িয়ে খেতে কত সময় লাগে
তুমি ভাবতেও পার না, একটার পর একটা বাস ছেড়ে দিই
আর চলন্ত বাসের চোয়ালে আমি সেঁটে দিই—
অ্যাতো অ্যাতো লোকের মধ্যে একজনও তুমি নও—
তোমার কিছু কেনার থাকে না— কোথাও যাও না তুমি—
তুমি ফেরো না— তুমি রাস্তা পেরোতে জানো না—
বাস থেকে ডাকতে পারো না তুমি—
আর বৃষ্টির মেঘ— তুমিই বা কী করো—
দূরে দূরে তুমি বিছিয়ে দিতে পারো না
তোমার দীর্ঘ চুম্বনের মতো আলো।

কোপাই

হাজার হাজার জনপদ আর জনমানুষের নিভৃত সাক্ষী তুমি—
চাঁদ— অন্ধকার ঠেলে তোমার উন্মোচিত হওয়াকে
স্বভাবতই এই শতাব্দী শেষে আমি উৎফুল্লচিত্তে
নিতে পারলাম না— যেমন আমি ধারণ করতে
পারলাম না সবচেয়ে মৃদু কথোপকথনগুলির
বিরাট বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ার রহস্য।
কী বলব সেই শিমুল গাছকে যার বয়সের ঠিক ঠিক
হিসাব করতে হলে আমাকে স্মরণাপন্ন হতে হবে
এই বাসভূমির সবচেয়ে বৃদ্ধতম লোকটির
হয়তো আমাকে পেরিয়ে যেতে হবে মাঠের পর মাঠ
কুয়াশার সঙ্গে— অন্ধকারের সঙ্গে যেখানে
যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে সার্বিক নির্জ্জান—
কী বলব সেই বিরহী পাখিকে— যে আমাদের
মনে করিয়ে দিতে চায় পৃথিবীর সমস্ত হারিয়ে যাওয়া
দুঃখের গল্প— যে আমাদের কান্নাকেই নকল
করতে চেয়েছে আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কুয়াশায়।

ভয়

হারিয়ে যাওয়া তারিখ ও বছর— তোমাদের সম্পর্কে
আমি কিছুই লিখে রাখিনি, মনেও নেই কিছু
তোমাদের সম্পর্কে, ঘটমান— তুমি কি সংঘটিত
হোচ্ছ নাকি আমিই তোমাকে সম্মান করে
তারিখ-ই-আলমগীর বলে সম্বোধন করছি
আগামী ও অনাগত— তুমি আমাদের ভবিষ্যতের মতোই অন্ধকার।
অন্ধকার— অন্ধকার তোমার বিরাট প্রাসাদে
আমার পদছায়াকে তুমি ধমকাচ্ছো কেন—
আমার নিশ্বাসকে তুমি শুষে নিচ্ছো— আর একটা
কুটোকাটা দেখিয়ে কেটে পড়তে বলছো আমাকে—
খানদানি আকার ইঙ্গিতে তুমি ক্রমাগত বলে যাচ্ছো
না-না, না-ই যদি তবে লোকে বলে কেন
ভবিষ্যৎ— ভ্রান্ত সব অভিজ্ঞানকে তুমি অসীম ধনের
মর্যাদা দিয়ে থরে থরে সাজিয়েছো তোমার
বিরাট প্রাসাদ— লোকে বলে কেন তবে।

হাতি

তুমি বল্লে শুশ্রূষাপরায়ণ হাতিকথা
বল্লে বিপন্ন হাতির স্বচেষ্ট উত্থান
আমি শোনালাম উপকারী হাতির কাহিনী
আমরা নিরুচ্চার থাকলাম সেই পাঁকে পড়া হাতির ব্যাপারে
যার বিপুল বপুতে এমনকী ব্যাঙও লাথি কষাতে পারে।
তুমি প্রথমে বল্লে উলিকট মানে নরম কাপড়
উলের চাদর মানে শীত করছে— এইটাই চিরঅর্থ তার
কিন্তু ঈদের চাঁদ যখন হাঁটা লাগিয়েছে
উদয় থেকে অস্তের নীলাভ পরপারে
তখনই শুরু হল তোমার সান্ধ্য পাঠদান—
উলিকটকে বল্লে বর্ম আর উলের চাদরকে
বল্লে অস্পৃশ্য আকাশ, তুমি প্রমাণ করে দিয়ে গেলে
যারা ভালোবাসতে জানে না তাদের হাত শুধু
ভাত খাবার জন্যে ব্যবহৃত হবে, নিরাপদ নিশ্চিন্তে
তুমি ফিরে গেলে— জেনে গেলে— রবিবার
যাচ্ছি আমি— দু-হাতে তোমার বিয়ে খেতে।

জুগুপ্সা

তিন তলা একটা বাড়ির উপরে যদি আরো একটা
তিন তলা বাড়ি চাপাই তাহলে আকাশের যেখানে
পৌঁছানো যায় আজ ফাল্গুন শেষের চাঁদ ভেসে আছে
সেইখানে। মণিশঙ্করবাবু— আপনি গড়িয়াহাট
স্ট্যানরোজ ফেব্রিকের কর্মচারী— আপনার মেয়ের
অ্যানুয়াল পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হয়েছে আর
আজই ওই চাঁদ উঠেছে আপনার তেতলা বাড়ির
দ্বিগুণিত দূরের আকাশে। এ তল্লাটে আমি ছাড়া
কেউই জানে না আপনার কিশোরী কন্যা সত্যি বলতে
আশ্চর্য সুন্দর— আপনি লক্ষ করুন আপনার পৈতৃক
টাকায় করা তিন তলা বাড়ির ওপর থেকে অশালীন ভূতের
আক্রোশে আমি সরিয়ে নিচ্ছি চাঁদ— আপনার ক্লান্তিকর
রক্তচক্ষু নিতান্ত উপেক্ষা করছি আমি— আজ আমি
হাজার হাজার মৃত পাতার গোরস্থানে পুঁতে ফেলব
চাঁদ আর পা ঝুলিয়ে বসে থাকবো অখাদ্য অসভ্য
কোনো গাছের মগডালে। তাছাড়া কীই বা করবে
কারুর কৈশোর গত হলে।

রসবোধ

আড়াআড়ি লেখার উপরে যদি লম্বালম্বি দাগ কাটি
মনে হয় ঝাউবনের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র ঝিলিক মারছে।
এই হল অনুভব, রসবোধও বলা যায় একে।
একে ওকে সকলকেই রসবোধ বলা যায়, যদিও
তা বলা হয় না সচরাচর। এই যে লিখতে বসে আঁকা,
আঁকতে বসে লেখা— এই যে খেতে বসে শোয়ার চিন্তা
আর শুতে গিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়া
এও এক ধরনের রসবোধ। কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকা,
সকলকে বিমর্ষ চোখে চাখতে চাখতে যাতায়াত করা—
এ সবই রস। এই সম্বোধনগুলি, এই শরতের ঝোপঝাড়ে
দূরদেশের প্রজাপতিগুলি, আকাশের বিদায়ী বিকেল—
ফুটবল মাঠের ভিজে ঘাস, এই যে বুকের মধ্যে জাপটে ধরা
করপল্লবের কষ্ট— সেও তো রসের। কিন্তু শীতের বাগানে
ঐ সারি সারি ফুলকপির উত্তল সবুজ কিনারে নুয়েপড়া
আমাদের দুঃখিনী মাকে কি আমরা রসবোধ বলব?
বলব নিশ্চয়ই— যেহেতু আমাদের রসবোধের কোনো
শেষ সীমা নেই। যেহেতু জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আমরা
থুথুর মতো ছিটিয়ে দিতে পারি আমাদের অসম্ভব রসবোধ।

বই

কত কত পয়সা খরচ করে আমি বই কিনেছি।
বই কিনতে এতদিন খুব একটা খারাপও লাগেনি।
খুব ভালো লেগেছিল গোর্কির লেখাগুলো, অনুবাদেও
আমি দারুণ অনুভব করেছিলাম রিলকের ডুইনো এলেজি।
রেজারেকশনের শেষ কয়েকটা পাতা আমি যে বাদ দিতে চেয়েছিলাম
সে কেবল বই পড়তে ভালো লাগত বলে।
মাঝে-মাঝে রূপসী বাংলা পড়ে দেখে নিতাম
চোখ ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এখন আমি এবং
আমার সমস্ত বই পরস্পরের দিকে হাঁ করে বসে থাকে।
তারা আমার তাকে থরে থরে অধিষ্ঠিত হয়ে
আমার মর্যাদা বাড়াতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার মর্যাদা
বাড়তে চায় না। বই পড়ে একদিন আমি জানতে পেরেছিলাম
ভ্যানগঘ, ব্যোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, গঁগ্যা এইসব মহানায়কদের
গৌরবময় মৃত্যুর ইতিবৃত্ত, তাদের মৃত্যুর গৌরব
বইয়ের পাতায় অভাগা মশার মতো মরে চেপ্টে
শুকনো খটখটে হয়ে আছে। ঝাড়া দিলে পড়ে যায়, নাড়া দিলে
ভেঙে যায় অসম্ভব ভঙ্গুর সব টুকরোটাকরা হয়ে।
টাকাপয়সা হলে বইয়ের তাকটা উঠিয়ে ওইখানে
লম্বা একটা টব বানাব, আর ঠিকই ধরেছেন
সযত্নে লাগিয়ে দেব লাল সাদা শালুকের ফুল—
ছোটো ঘর— ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে প্রস্ফুটিত নির্ভার প্রজ্ঞার
ব্যাখ্যাহীন ভাষ্যহীন জলজ পুষ্পের ভালোবাসা।

খাড়া প্রাচীরের সামনে

খাড়া প্রাচীরের সামনে এক এক জনের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম
কেউ তার দৈর্ঘ্য বরাবর শেষ দেখতে চায়, কেউ তার
নিজের দিকে ঝুঁকে আসা উচ্চতা টপকাতে চায় সাধ্যাতীত শ্রমে
চটজলদি চুনকাম মেরে লেখা হয় জিন্দাবাদ-বন্দেমাতরম
সামান্য ইটের টুকরো লিখে রাখে টুম্পা + সুদীপ্ত শিকদার
কেউ আবার লাভ সাইন, রেখাচিত্রে যৌনাঙ্গ আঁকতে
বেছে নেয় প্রকাশ্য প্রাচীর-পটখানি, কারও পিঠ ঠেকে যায়—
ঊর্ধ্ববাহু— অসহায়— পরপর দাঁড়িয়ে পড়ে— এককালীন
যতজন দাঁড়ানো সম্ভব, অন্য একজনকে দেখি
পূর্ণ নিমগ্নচিত্তে হিসি করছে দ্ব্যর্থহীন জোরালো ধারায়।
খাড়া প্রাচীরের সামনে আমাদের প্রতিক্রিয়া
এরকমই বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়।

ভালোবাসার কবিতা ৩

এই গ্রহে আমার জন্ম, জন্মস্থান ছেড়ে আমি
একদিনও ঠাঁইনাড়া হইনি। এইখানে বাঁচতে বাঁচতে
আজ আমি বুঝতে পারছি— দিন আমার কনুই
আর রাত আমার গোড়ালি ছাড়বে না।
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই গ্রহ শূন্যের সম্পদ
এবং তা গোলাকার। যদি আমি চিৎকার করে ডাকি—
সনাতন— সনাতন আমার বন্ধু— যদি আমি
চিৎকার করে ডাকি— আম কাঁঠালের ছায়া—
তারা আমার পূর্বপরিচিত। আজ রাতেই আমি
সকলকে ডেকে জড়ো করতে পারি। এই আমার
পরিচয়সারণী— এই আমার বুকের গভীরে জ্যান্ত
হৃদপিণ্ডের অবাধ রক্তপাত— অসম্ভব বিশ্বাসে আমরা
পরস্পর তুমি বলে সম্বোধন করেছি—
তোমার পিঠের কাছে যেখানে শূন্যের শুরু
বাহুডোরে সেইখানে বেঁধেছি তোমাকে
তুমি বুধবার বোলো না— বুধবার—
বুধবার বলে কিচ্ছু হয় না— সমস্তই
আকাশের টানেলে এক অপূর্ণাঙ্গ প্রাণীর প্রলাপ
সকালে যে বাঁচতে আসে রাত্রে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
আজ— শুধু আজই আমাদের আয়ুষ্কাল।
অতীতে ছিলাম না আমরা ভবিষ্যতও আমাদের নয়।

চাঁদপুর

গ্রামবাংলার দিকে চোখের চাওয়ার মতো জলাভূমি দেখি
দেখি মাঠ— ব্যাপ্ত নিশ্চেতন কৃষি— একর একর অন্ধকার
কুপির নিশানা দূরে— দূরে দূরে বাতাসতাড়িত বসবাস
এইখানে সামান্য কথাও চতুর্গুণ জোরে বেজে ওঠে
নৌকোর ছৈয়ের মতো সোনাঝুরি জারুলের আর্চ
সমস্ত পথটিকে যেন পাথেয় বলেই মনে হয়
বাঁশের মাচায় বসলে, তেলেভাজা আদা-চা ছাড়াও পাচ্ছো
অবিশ্রান্ত উদ্দাম বাতাস, কাঠপোলের গোড়ায়
একজোড়া সঙ্গমবদ্ধ নির্বাক কুকুর— পাঁচজন জনসাধারণ
গ্রামবাংলারই মতো লম্বা লম্বা কিছু আলোচনা করে
তারা বলে কম্পনের কথা— হিংসা ও অহিংসার কোনো
মধ্যবর্তী কম্পনের কথা— ভাদ্রের সন্ধ্যায় তারা
তাদেরই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কিছুতেই
ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে না। চা-দোকানির বউ
লালশাড়ি ঘোমটার আবডালে পনেরো মিনিটের একটা
কালো মতো ঝিমটি দিয়ে ওঠে। যদিও এসব রূপকথা
ঈশ্বরের নিজস্ব নির্মাণ— সন্ধের সময় তিনি এই ধরনের কিছু
গ্রাম ও বাংলা আঁকতে পছন্দ করেন
সেখানেই ক্ষান্ত দেন না, নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে
তিনি একথাও জিজ্ঞাসা করেন— এদিকে জমির দাম
বর্তমানে কেমন যাচ্ছে ভাই।

নাট্য সমালোচনা

অতি দীর্ঘ হয়ে গেল এই একঘেয়ে নাটক
চরিত্রের তেমন কিছু করার ছিল না নাকি
নাট্যকার নিজেই চাননি এ-জাতীয় একক অভিনয়ে তাঁকে
অতখানি চাপ নিতে দিতে। উত্থান পতন নেই
ভৌগোলিক রাজনৈতিক কোনো পটপরিবর্তন নেই
ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে খালি মাঝে মাঝে নায়কের
বাবা মা দাদা দিদি ভাই ভাইপো ভাইঝি ইত্যাদি প্রভৃতি কিছু
চরিত্রের ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে আসছে, বস্তুতই অকারণে, কেন না
তা নায়কের মৌলিক চরিত্রে কোনো প্রভাবই ফেলছে না
হয়তো ফেলছেও কিছুটা নয়তো নায়ক তার দীর্ঘ চল্লিশ বছর
বয়স অবদি খাটে শুয়ে পা নাচিয়ে কাটাল কীভাবে আর
দর্শকও দেখল এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর বেশ কেটে গেল
সত্যি সত্যি পা নাচিয়ে, স্রেফ খাটে শুয়ে পা নাচিয়ে।
সে নাকি পেশায় পেইন্টার— একটা ছবিও তাকে আঁকতে দেখা গেল?
স্বভাবে প্রেমিক— কিসে প্রেম-কেন প্রেম-কার সঙ্গে প্রেম
কিছু কী পরিষ্কার হল টেক্সট থেকে— শেষ দিকে দেখা গেল
যাবতীয় চারিত্রগুণ একে একে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে
যেভাবে আত্মীয়কে লোকে ছেড়ে যায় অথবা
আত্মীয় যেভাবে কাউকে ছেড়ে চলে যায়
চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে অসম্ভব অ্যালকোহলিকও দেখা গেল
এ কেমন পরিণতি— যার অমন ফুলের মতন ছেলেবেলা
কাঁটার আঘাত তাকে সইতে হবে— নেমেসিস যদি তাই চান—
চাইতেই পারেন তবে অ্যালকোহলিজম শব্দে
আপত্তির কারণ রয়ে যায়; কিউবিজম— মার্কসিজম
এসব তো আছেই আবার অ্যালকোহলিজম কেন—
যাই হোক— আলোকসম্পাত ভালো নয়।
এর চেয়ে খারাপ নাটকে আলোর প্রয়োগ
তুলনামূলকভাবে ভালো— দেখা গেছে। পরিশেষে
একক চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর জাত চেনাতে
ভুল করেননি অভিনেতা যদিও দুর্ভাগ্য তাঁর
পারটিকুলারলি এই ক্ষেত্রে তাঁর কিছু করার ছিল না।

এই কবিতাগুলি তন্ময় মৃধার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
এখানে আগের বানানরীতিই বজায় রইল। — সম্পাদক

আলোচনা

তন্ময় মৃধার কবিতাজগৎ

সোমক দাস

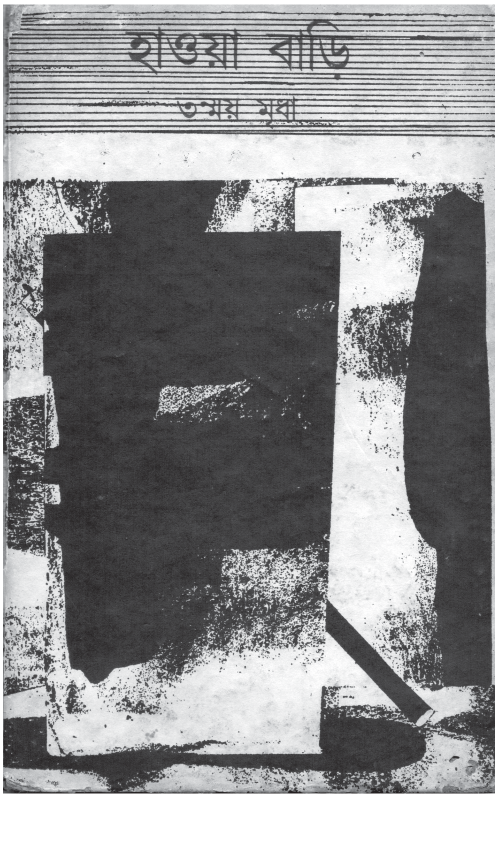
কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিম, স্বাভাবিক ও জোর করে, মানে লিখতে হয় বা হবে বলে লেখা— এ-রকম, দু-রকম হতে পারে। আরও অনেকরকম হতে পারে। তবে আপাতত এই দু-রকম লেখার মধ্যেই থাকছি। তন্ময়ের লেখা, বলা যায়, এই দুইয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কবিরা অনেকসময় না বুঝে সত্যিকথা লিখে ফেলেন। সে-কথায় পরে আসছি। তন্ময় সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির কথা বলতে-বলতে হঠাৎ জটিল হয়ে পড়েন। 'আমিও মূর্খের মতো কীসব চরিতামৃত লিখি / অলীক একার সামনে এরা কেউ প্রতিপক্ষ নয়।' কিংবা, 'প্রসন্ন বন্যায় শস্যহানি মড়া ও মড়ক...'। ইত্যাদি। বন্যা প্রসন্ন? কী করে সম্ভব? তন্ময় সুন্দরবনের আদি বাসিন্দা বলেই হয়তো এ-রকম ভাবা সম্ভব। 'প্রসন্ন হয়েও তবু ঝড় ও ঝঞ্ঝার মতো কিছু কিছু সমীহও থাকে'। তারপর হঠাৎ সহজ হয়ে যান তন্ময়। 'ওরে ও দোদুল্যমান প্রভা তুমি এই যাপনের অভিসারে এসো।' এসব প্রসঙ্গ কথা, তন্ময় যে সবসময় বানিয়ে লেখেন না, সেটা বোঝাতেই বলা হল।

তন্ময় মৃধার কবিতায় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে ভাষা, বিষয়, শব্দ নির্বাচন। বেশিরভাগ লেখাই সহজ গদ্যছন্দে। মাঝে মাঝে সাধুভাষাও ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে আপাত অর্থহীন পঙ্ক্তিও আছে। 'প্লুটোর রেলিং থেকে ঝুঁকে আছে অপাপবিদ্ধ মেয়ে / দেখিলাম মাইম শুরু, বুঝিলাম না শেষ'। অথচ সরল গদ্যে মাঝে মাঝে চমকে দেওয়ার মতো অজস্র পঙ্ক্তি তিনি লিখতে পারেন। 'শাণিত কলম দেখে মেতে উঠি বিরল উল্লাসে / আমার সমস্ত পুষ্টি আসলে তো মৃত্যু থেকে পাওয়া।'

তন্ময়ের বিষয় বৈচিত্র্য অসাধারণ। সুদূর সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চল থেকে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, আর্ট কলেজ হয়ে বর্তমানে শিল্পশিক্ষক তন্ময়। তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কম নাকি! তবু তাঁকে লিখতে হয়— 'প্রলয়ের পূর্বাভাসে রক্তের গর্ভে জমে উন্মুখ বিক্ষোভ / আমি এই সুচারু বৃত্তের থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে চাই।'

নানা বিষয়ে ঘোরাফেরা করেছেন তন্ময়। তার মধ্যে কিছু মৌলিকতাও আছে। 'আমি এই শূন্যগর্ভে প্রার্থনার মতো বেঁচে আছি'। 'এক অসহ্য প্রবাস'-এর মধ্যে বেঁচে থাকেন এই কবিতালেখক। 'মন্দিরের লাল' তাঁকে 'নাগরিক অভিমান' দেয়। 'অশুভ হিংসার মতো হাওয়া কেটে উড়ে যায় রাতচরা পাখি'। কবিতায় সত্যিকথা বলার আশ্চর্য স্পর্ধা আছে তন্ময়ের। 'পীতাভ তীর্থের এই নিশিডাক আরতির যৌনগন্ধ'— ইত্যাদি। 'আমরা জন্মের কথা— আমরা সংঘর্ষের কথা ভুলে / পুরোপুরি ব্যয় হই।' কিংবা 'অনল তোমাকে আমি কদাচিৎ নিকটে পেয়েছি'।

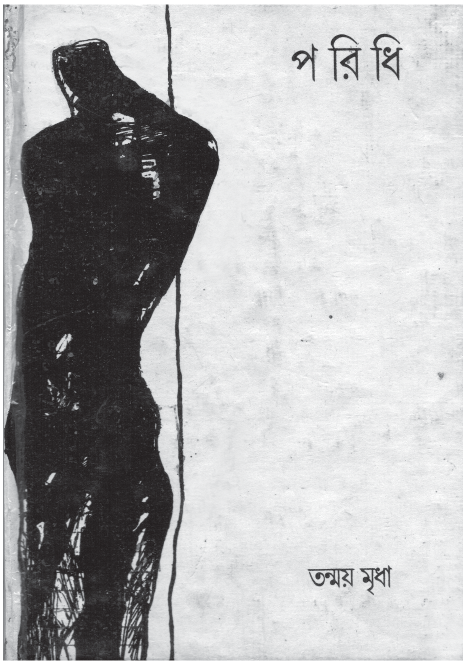
মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, যেকোনো বিষয় নিয়েই কবিতা লিখতে পারেন তন্ময়। নিজের বয়স বাড়া, চারপাশের জগৎ, গভীরে যাওয়া, হঠাৎ পাওয়া অনুভূতি— সবই তাঁর কবিতায় আসে খুবই সহজে। 'উড়ো দুপুরের দিকে চরাচর খবর রটায় / আত্মহত্যা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।।' স্বয়ং তথাগতকেও ছেড়ে দেননি তন্ময়। 'তোমার গৃহত্যাগ কষ্টকর নয়— / সফেদ পায়স আর সুজাতার আনুকূল্য... এ সময়ে ঘরছাড়া সুবিধাজনক মনে হয়'।



হাওয়া বাড়ি, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৬। প্রচ্ছদ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

নিজেকে ক্লাউন ভাবতেও অসুবিধে হয় না তাঁর। একদিকে চার্চ— অন্যদিকে গণিকাপল্লী— মাঝখানে ‘মাখো তেল ঈশ্বরপ্রেরিত’। নিজেকে নিয়ে মাঝে মাঝে তির্যক ব্যঙ্গ করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যথেষ্টই আত্মপ্রত্যয়ী। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অল্পস্বল্প সাংসারিক কথা সেরে নিয়ে একদিন বানপ্রস্থে যাওয়ার বাসনা ছিল কবির। অথচ তিনি বিয়েই করে উঠতে পারলেন না। তাহলে কি এটাই ঠিক যে কবির দাম্পত্য শুধু কবিতার সঙ্গেই হতে পারে! যিনি ট্রাউজারের গোপন পকেটে করে কবিতার অঙ্কুর নিয়ে, নেশাগ্রস্ত, খুব সরু আর সতর্ক রাস্তা ধরে হেঁটে যান।...

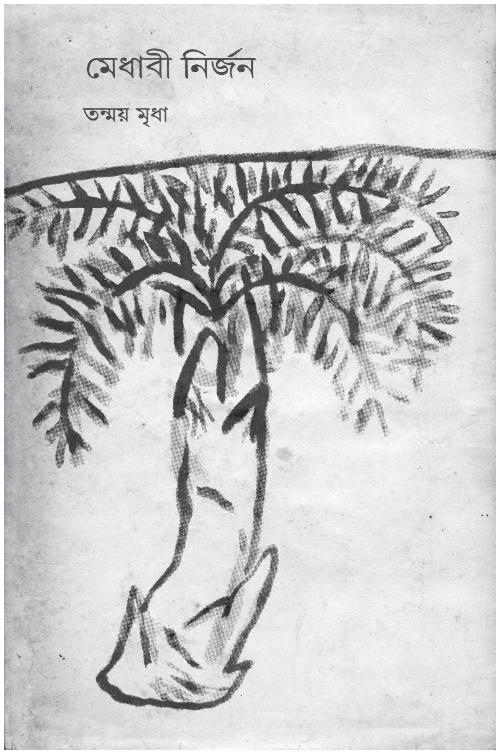
ঝাড়গ্রামের সাঁওতালপাড়ায় মোরগলড়াই, ডুলুং-এর রোদ, শালের জঙ্গল, আকণ্ঠ নেশার মধ্যে ঝুঁকে থাকা ভাটিখানা, প্রবাসপ্রস্তাব, নিজস্ব কবর খুঁজে পাওয়া, নদীর সাথে কথা বলা, কেঁদে ফেলা, বিদ্যা ও অবিদ্যা মিশে প্রেমিক-প্রেমিকার মাথা নাড়া, ক্ষয়ের সান্নিধ্য— কী লেখেননি তন্ময়! তাঁর পক্ষেই তো বোঝা সম্ভব— ‘কবি এই পৃথিবীর দ্বিতীয় ঈশ্বর’। ভূতে-পাওয়া বয়ে-যাওয়া ছেলে যেন, যে এক হাতে আঁকড়ে আছে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষ, অন্য হাতে ছুঁয়ে আছে পুনরুজ্জীবন। অথচ যে জানে— কথা মানে শব্দের মূর্খতা। অথচ— না চাইতেই ভালোবাসা হয়।



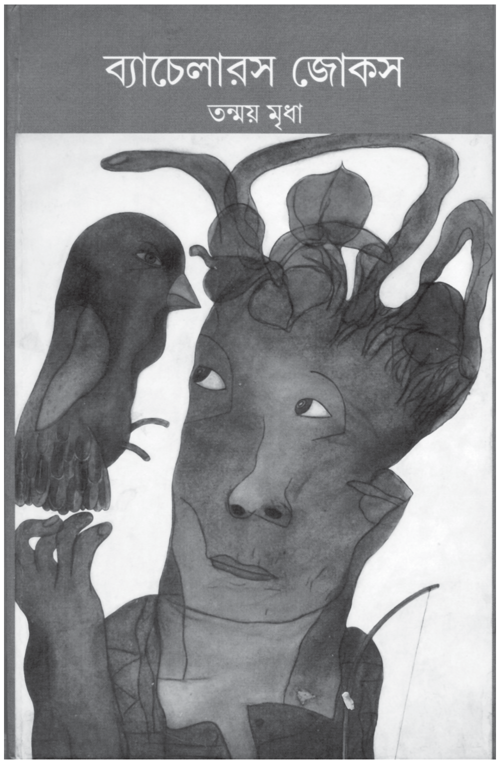
পরিধি, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৯
প্রচ্ছদ তন্ময় মৃধা

মাঝে মাঝে ছন্দেও লিখেছেন তন্ময়। তবে গদ্যছন্দেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হাওয়া বাড়ি* অধুনালুপ্ত *প্রমা প্রকাশনী* থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বইমেলা ১৯৯৬ সালে, দাম ছিল বাইশ টাকা। সেই বইটি পড়ে এসব কথা মনে হল। পরের বই *পরিধি*-ও ‘প্রমা’ থেকেই প্রকাশিত। বইটি *বৃত্ত* ও *পরিধি*— এই দু-টি অংশে বিভক্ত। প্রথম বই-এর তিন বছর পরে প্রকাশিত। ততদিনে পালটে গেছে প্রকাশভঙ্গি। সব কবিতাই সরল গদ্যছন্দে লেখা। ‘একদিন মরার আগে সবকিছু লিখে রাখব, / কড়ায় গণ্ডায় সব লিখে রাখব—’।

এর পরের বই *মেধাবী নির্জন* আবার দু-বছর পর, প্রচ্ছদ কবির। প্রকাশক— কঙ্কাবতী দত্ত, কেন কে জানে! এটিও সরল গদ্যে লেখা— মনের সমস্ত কথা ঢেলে উজাড় করে দিয়েছেন কবি। ‘ধীরে ধীরে এই পৃথিবী একদিন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো...।’



মেধাবী নির্জন, কলকাতা, ২০০১। প্রচ্ছদ তন্ময় মৃধা



ব্যাচেলারস জোকস, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১০। প্রচ্ছদ তন্ময় মৃধা

পরের বই *ব্যাচেলারস জোকস*— এরও প্রচ্ছদ কবির, প্রকাশকাল ২০১০ সাল। প্রকাশক *ভাষাবন্ধন*। এটিও গদ্যকবিতার সংকলন। আগের চেয়ে ক্রমশ আরও খোলামেলা, আরও জীবনের গভীরের দিকে অনুসারী হয়েছেন কবি। অত্যন্ত স্বকীয় ভঙ্গিতে। তন্ময়ের কবিতা সম্পর্কে এটাই শেষ কথা।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

‘কবিতা তো আসলে খারাপ গান, আর গান হল খারাপ কবিতা। গান থেকে সরাসরি রিমেক করেছি...’

ক থো প ক থ ন

তন্ময় মৃধা

কবিতার কথা, ছবির কথা। কবিতাভাবনার কথা। উঠে এল আজকের সময়, কলেজবেলার প্রসঙ্গও।
বোধশব্দ-র পক্ষ থেকে কবি তন্ময় মৃধার মুখোমুখি **মিথুন নারায়ণ বসু**।

তোমার কবিতায় আগাগোড়া একটি আপাত বিচ্ছিন্নতা, এক ধরনের এলিয়েনেশনের সুর শুনতে পাই। এমন একজন কবিকে দেখতে পাই, যে সমূহ লাইম লাইটের আওতা থেকে নিজেকে গোসাবার লাজুক কিশোরটির মতো যেন সযত্নে গোপন রাখতে চায়। মাত্র চারটি কবিতার বই, অথচ একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে তোমার স্বীকৃতি। এই পুরো যাত্রাপথটি নিয়ে তোমার অন্তর্গত সেই কিশোরটির বক্তব্য কী, তা জানতে ইচ্ছে করে...

এমনিতে নন্দনতত্ত্বের পরিসরে দূরত্বের একটা কথা আছে। ‘এলিয়েনেশন’ শব্দটা অনেক পরে শোনা। আউটসাইডার। বাহিরানা, খারাপ কী! পরের জায়গা পরের জমি, ঘর বানাইয়া আমি রই! আমি আছি, আবার নেইও। নন্দীগ্রামে নেই, কামদুনিতে নেই, সিঙ্গুরে নেই, ভাঙড়ে নেই, কলেজে নেই, ইশকুলে নেই, উন্নয়নে নেই। সিস্টেমের অনেক কিছুতে আমি সত্যিই নেই। আবার আমি আছিও তো। সংযোগ আর সংযোগহীনতার এই টানাপোড়েন আছে।

স্বীকৃতি? হবে হয়তো! দ্যাখো, সৃষ্টিশীল মানুষ মাত্রেই স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। স্বীকৃতি আমার কাছে অচেনা কোনো বিষয় নয়। অপ্রত্যাশিত নয়, তাই বলে আমার ন্যায্য বা মৌলিক অধিকারও নয়।

তোমার প্রথম বই ১৯৯৬-এ প্রকাশিত হলেও পত্র-পত্রিকায় কবিতার প্রকাশ এবং সাধারণ পরিচিতির সূত্রে তোমাকে আটের দশকের কবি হিসেবেই চিনি। এইরকম দশক-ওয়াড়ি বিভাজনে তুমি কতটা স্বচ্ছন্দ?

মধুসূদন কোন দশকের কবি? দশক ব্যাপারটা কবির রচনাকালের এক ধরনের হিসেব। এই করতে করতে শূন্য দশক। ভাবা যায়? বরাহমিহির ঘাবড়ে যাবে! আমি নয়ের দশকের কবি— আমরা শূন্য দশকের কবি— আমি এগারো নম্বর ওয়ার্ডের কবি— মায়া হয়।

ধরো, যদি সুবিধার্থে এমন বিভাজন মেনেও নিই, তবে তোমার সমসময়ের, মানে, তথাকথিত আটের দশকের কবিতা ও কবিদের সম্বন্ধে তোমার মূল্যায়ন কী? বা, সেই সময়ের বা তার খানিক আগের কাদের লেখা তোমায় প্রাণিত করেছে?

তথাকথিত পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা ছিলেন আলালের ঘরে দুলাল। মিডিয়া তখন কবিকে নায়ক বানাত। ব্যাঙ্ককর্মী কবিতা পড়তেন। কোন বাস্তবতা থেকে তিনি উঠে আসছেন, সেটা বড়ো কথা নয়। মিডিয়া বলছে তিনি কবি, সুতরাং তিনি হিরো। বাস্তবতার বোধহীন কবিতাকেন্দ্রিক ভিত্তিহীন উল্লাসের ওই নীল জগৎকে কার্যত নাকচ করতে পেরেছিল সত্তর দশক। বাস্তবতার প্রতি দায়বোধ, সমাজে একজন কবির প্রকৃত অবস্থান, এইসবের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত প্রকাশভঙ্গির অনুসন্ধান— এইরকম কিছু অঙ্গীকার ওই সত্তর দশকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। আমরা বোধহয় ফাঁক, ফাঁকি, সীমা ও সম্ভাব্যতার দিকগুলো খুঁটিয়ে বুঝতে চাইছিলাম। এক বছর, দু-বছর, দশ বছর— কবিতার জন্য এমন কোনো সময় নয়। তবু আমাদের সময়টাকে এভাবে দেখা যায়— হয়তো। আভিজাত্য ও আরোপিত আভিজাত্য থেকে বাংলা কবিতার ভূগোল সরে যাচ্ছিল মফস্‌সল ও গ্রামশাসিত পশ্চিমবাংলার দিকে।

আমাদের ঠিক আগের ও সমসাময়িক প্রিয় কবিদের তালিকাটি মোটামুটি এরকম— জয় গোস্বামী, সোমক দাস, রণজিৎ দাশ, নির্মল হালদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ পণ্ডা, সার্থক রায়চৌধুরী, বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধায়, সুদীপ বসু, প্রবুদ্ধসুন্দর কর...। তবে, তালিকাটি আমার পাঠের ঊনতা এবং বোধের অসম্পূর্ণতার কারণে চূড়ান্ত খণ্ডিত।

এই সময়ের কোনো কবিতায় এমন কোনো অভিজ্ঞান কি দেখতে পাও, যাকে অব্যর্থভাবে আটের দশকের উত্তরাধিকার বলে চিহ্নিত করে নেওয়া সম্ভব?

না, আটের দশক ওরকম কোনো সুনির্দিষ্ট আবিষ্কারকে তার পরবর্তীদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যায়নি। ফলে আটের দশকের প্রভাবের প্রশ্নও ওঠে না। বরং কিছুক্ষণ আগে ওই সাত ও আটের দশকের চরিত্র বোঝাতে যে-কথাগুলি বলছিলাম— পরবর্তীকালের কবিতায় এ-সমস্ত বিষয় যেন প্রতিদিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকল। এরকম একটা অনুসিদ্ধান্তে আসতে আমার ইচ্ছা করে।

তোমার আরেকটি পরিচয়, তুমি চিত্রশিল্পী। একজন মানুষের, বিশেষত একজন সৃষ্টিশীল মানুষের একাধিক সত্তা ও পরিচিতিতে কি তুমি বিশ্বাস কর? এর মধ্যে কোনো একটি তোমার মৌলিক সত্তা, না কি তোমার আইডেন্টিটি এই বিভিন্ন ও বিচিত্র সত্তা ও পরিচিতির একটি যৌগ সমাহার?

হ্যাঁ, আমি প্রায় জন্মগতভাবে একাধিক শিল্পমাধ্যমে স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সফল নই। এই

একাধিক সত্তার ব্যাপারটা স্রেফ উপভোগ করতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত কাজের খুব ক্ষতি হয়েছে। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, বহু কবিকে খুব কষ্ট করে ছবি বুঝতে হয়। বা, অসম্ভব বোঝে বলে ভান করতে হয়। আবার শিল্পীরা তো কবিতাকে তার উচ্চশিক্ষিত বান্ধবী ভাবে! এমন নাট্যকার দেখেছি, যে কখনো মন দিয়ে একটা ছবিও দেখেনি। রবীন্দ্র সংগীত গায়— রবীন্দ্র চিত্রকলার ন্যূনতম অনুধাবন ছাড়া। এরকমটা অবশ্য চিরকাল হয়ে এসেছে। তবু সহোদরের সঙ্গে সম্পর্করহিত মানুষকে কেমন একটু বেয়াক্কেলেও কিন্তু মনে হয়। এটা ঠিকই, এইসব একাধিক সত্তার মধ্যে আমি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করি। চেষ্টাকৃত নয়। একাধিক শিল্পমাধ্যমের আমি সহজ উপভোক্তা।

কবিতা ও চিত্রশিল্পের মধ্যে কোনটি তোমার মহত্তর বলে মনে হয়?

তরতম বিচারের আমি কে? এ তো সবারই জানার কথা, কোন শিল্পমাধ্যম কতখানি উচ্চতায় অধিষ্ঠান করে। কবিতা এবং চিত্রশিল্প, দুটোই অত্যন্ত প্রাচীন এবং অসম্ভব উচ্চতরের শিল্প। এরা মানবসভ্যতার সমবয়সি।

তোমার অনেক লেখাতেই সংগীতের প্রসঙ্গ আসে। বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমগুলি যেন মিলেমিশে যাচ্ছে অনুভবে এবং প্রকাশেও। তোমার কবিতা ও কবিসত্তায় গান শোনার প্রভাব কতটা?

একজন কৃষকের কাছে বৃষ্টি যেমন, গান আমার কাছে অনেকটা সেরকম। বুদ্ধি বিকশিত হওয়ার পর থেকে গান আমার আপনার। ঘরানা নেই; চাষার ছেলে তো। যেমন খুশি শুনতে শুনতে এগিয়েছি। বড়ে গোলাম আলি শুনতে শুনতে কাত হয়ে পড়তে হবে, এরকম অভিজাত উত্তরাধিকার আমার নয়। যাত্রা, কীর্তন, কবিগান, রামায়ণ-গান, নাম সংকীর্তন, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সরস্বতীপুজো, রেডিয়ো— এইরকম একটা পটভূমি থেকে আমার গান শোনার শুরু। কবিতা তো আসলে খারাপ গান, আর গান হল খারাপ কবিতা। গান থেকে সরাসরি রিমেক করেছি— 'ওরে কিশলয়' (সন্তোষ সেনগুপ্ত) থেকে *মেধাবী নির্জন*-এর *কিশলয়*। চুরি।

তুমিই লিখেছ, 'ব্যক্তিগত কথা কবিতায় ব্রাত্য', কিন্তু তোমার কবিতায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অনুষঙ্গ খুব ঘনঘন আসে। নিজের লেখায় কনফেশন ও গ্রস জেনারেলাইজেশনের মধ্যে তুমি কীভাবে ব্যালেন্স কর?

মমেতি চ মমেতি ন— কীসব কথা আছে না? শতাব্দীপ্রাচীন বিধান। আমার মধ্য দিয়ে যদি তোমার দিকে না যাওয়া যায় অথবা তোমার মাধ্যমে যদি আমার কাছে না পৌঁছোনো যায়, তাহলে এসব কার জন্য!

পারিবারিক জীবনের মতোই তোমার বহু লেখায় উঠে আসে কলেজজীবন এবং উঠে আসেন বাস্তবের বন্ধুজন। তোমার ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনে কলেজ বয়েসের ভূমিকা কী ছিল? তোমার কবি-শিল্পীসত্তায় সবথেকে বেশি প্রভাব কাদের?

আসলে আমি যতই ভান করি না কেন প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ, বন্ধুবান্ধব... এসব আমি খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি, আসলে তা হয়তো নয়। আসলে হয়তো এগুলোই আমার সত্তাকে নির্মাণ করেছে। তাই এত উল্লেখ। শহরটা কলকাতা। মানুষগুলো কিন্তু পশ্চিমবাংলার। অসংখ্য মানুষের প্রভাব। অসংখ্য মানুষের প্রেরণা রয়েছে। সত্যি সত্যি বলতে গেলে অনেকটা বড়ো হয়ে যাবে। সংক্ষেপে বললে হবে খণ্ডিত। শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়... জয়ন্ত সেন, অচ্যুত মণ্ডল, অপূর্ব সাহা, ব্রাত্য বসু, সুপ্রিয় ঘোষাল, অদ্রীশ বিশ্বাস, চিরঞ্জীব সরকার, শিলাদিত্য চক্রবর্তী, অর্পণ চক্রবর্তী, সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়, রজতনারায়ণ রায়চৌধুরী, অভীক মজুমদার, শমীন্দ্রনাথ মজুমদার, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা পাল, সোমা রায়, সুতনিমা রায়, স্বাতী চক্রবর্তী, সুতপা চক্রবর্তী... কত বলব! আমি শেষ করতে পারব না। লোকে যদি অটোর পিছনে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ লিখতে পারে, আমি কি এঁদের কথা লিখতে পারব না?

এই বন্ধুবৃত্ত ও যৌথতার প্রতি তোমার আকর্ষণ ও নির্ভরশীলতা বহু লেখায় এসেছে। আবার এর উলটোদিকে বেশ কিছু লেখা দেখি যা প্রকৃতিতে নিহিলিস্ট— যাবতীয় যৌথতা ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে ফুৎকারে উড়িয়ে যেখানে নিঃসঙ্গ যাপনের উদ্‌যাপন চলে। এই দ্বৈততা ও পরস্পর বিরোধিতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

দ্বৈততা বা পরস্পর বিরোধিতা— এগুলো কোনো দোষ নয়। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক মানসিক গঠনের অন্তর্গত উপাদান। একটি সুনির্দিষ্ট দর্শনের বশবর্তী হয়ে চলাটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়নি। একটি স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষের সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণগুলিকে মূল্য দিতে চেয়েছি এবং সর্বতোভাবে রক্ষা করতে চেয়েছি।

পরস্পর বিরোধিতা আরও আছে। তোমার বহু লেখায় আসঙ্গলিপ্সা প্রায় দৈন্য ও ভিখিরিপনায় পর্যবসিত হয়েছে। '...অর্ধেকজীবনব্যাপী বলে আসছি— এই গ্রহে না থাকুক / প্রাণ আছে— অন্য গ্রহে আছে।'— এমন চমকপ্রদ লাইন তুমি লিখেছ। আবার ওই *ব্যাচেলারস জোকস* বইয়েরই *পরিসংখ্যান* কবিতাটি থেকে



'হান্টার', কাগজে অ্যাক্রিলিক



'কমিউনিকেশন স্কোয়ার', কাগজে জল-রং

তোমাকে প্রবল নারীবিদ্বেষী এবং নিরাশাবাদী বলে মনে করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। একজন কবি বা শিল্পীর প্রাথমিক দায় কি তাঁর অনুভূতির প্রতি সৎ ও নিষ্ঠ থাকা, না কি পলিটিক্যালি কারেক্ট হওয়া?

ঠিক তাই। এতগুলো আমি, বহু আমি— তোমার অনেক প্রশ্নই আসলে আমার তরফের উত্তরের মতোই। নিজের এবং নিজের অনুভূতি ও প্রবণতার কাছে দায়বদ্ধতাই আসলে পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার একমাত্র উপায়। আর, না, আমি ঠিক নারীবিদ্বেষী নই। মেয়েদের বোঝার ক্ষেত্রে কোথাও হয়তো কিছু সমস্যা রয়েছে আমার।

তোমার বহু লেখায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়। *পরিধি*-র 'মেগাসিটি প্রকল্পের আওতায়...' কিংবা 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন মানে চুল...', বা *ব্যাচেলারস জোকস*-এর *শুচিবায়ু, আত্মসম্মান, বর্ডার* প্রভৃতি লেখার কথা তো বলাই যায়। তোমার মতে কবির রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন তাঁর কবিতায় কতটা কাঙ্ক্ষিত?

এই *পরিধি* বইটির *পরিধি* অংশটি সত্যিই যথেষ্ট রাজনৈতিক। 'প্রমা'-র সুরজিৎ ঘোষের বাড়িতে বসে প্রুফ দেখা চলছে। হঠাৎ উনি একটু নিচু স্বরে বললেন— এসব তুমি লিখেছ, তোমার প্রথম বইতে তো এসব এত ছিল না— যাই হোক— আমার বয়স হয়েছে, আমার আর কী! তুমি সামলাবে। — মনে পড়ল।

আর হ্যাঁ, আমার একটু রাজনীতির বাতিক আছে। মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের এই যে আকাঙ্ক্ষা— এই ন্যাকামোটা আমার আছে। এগুলোকে আমি বাতিক বা ন্যাকামো বলছি এই কারণে যে শাসক তাই ভাবে। আর রাজনীতিহীন শিল্প অনাদিকাল অসম্ভব। শিল্পের পরিসরে রাজনীতির অসংখ্য শেড্‌স। কখনো কখনো তাকে আলাদা একটা রসই মনে হয়। রাজনৈতিকভাবে সাড়া না দিয়ে শিল্পীর যেমন উপায় নেই, তেমনি রাজনৈতিকভাবে একেবারে অসম্ভব না হলে জন্মান্তরহীন এই দুনিয়ায় শুধু ব্যক্তির বাঁচাটুকুও খুব লোভনীয় বিকল্প হতে পারে।

ব্যক্তিজীবনের মতোই তোমার কবিতাও উইট-প্রধান। কখনো তা প্রবল সারকাস্টিক, কখনো নিজেকে নিয়ে প্রসন্ন হিউমারে মত্ত। এই সারকাজম ও হিউমারের প্রবণতা কি তোমার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক? মানে, তোমার কবিতায় হাস্যরসের ব্যবহার কি স্বতঃস্ফূর্ত, না সচেতন প্রয়াসসাধ্য?

ওই... সেই অনেক আমি-র একটা। দ্যাখো, জোর করে কেউ হয়তো হাসতে পারে, কিন্তু জোর করে হাসানো যায় না। আমি হাসতে এবং ফলত হাসাতে ভালোবাসি। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র জীব, যে হাসতে পারে। ঈশ্বরের অনন্য উপহার। যথাযথ মর্যাদা না দিলে স্রষ্টাকেই অপমান করা হবে। তারপরেও— যে আঁখিতে এত হাসি লুকানো / কূলে কূলে তার কেন আঁখি-ধার— তালাদ মাহমুদ। হ্যাঁ, অশ্রু কিন্তু আছে।

আবার আপাতভাবে যতই সারকাস্টিক তোমাকে মনে হোক, অনেক লেখাতেই তোমার প্রবল রোমান্টিক একটি মনকে দেখতে পাই...

আসলে, মানুষের কোনো অভিব্যক্তিই কালক্রমে অচল হয়ে যায় না। রোমান্টিকতা একটি সদর্থক অভিব্যক্তি। তবে আমার মনে হয়, আমি একটু বাস্তবতার দিকে বেশি ঝোঁকা।

তোমার কিছু লেখায় চাপা যৌন টেনশন দেখতে পাওয়া যায়। *হাওয়া বাড়ি*-র *ভালোবাসা-আক্রান্ত কবিতা* কিংবা *প্রণাম*, বা নতুন লেখাতেও কখনো এই সুর রয়েছে। *ব্যাচেলারস জোকস*-এর *পরিচর্যা* অথবা *এক কিশোরের প্রতি* কবিতাগুলিতে এমনকী বিকল্প যৌনতার অনুষঙ্গও আবিষ্কার করা সম্ভব। কবিতায় যৌনতার প্রকাশে, তার অকুণ্ঠ কনফেশনে তুমি কতটা স্বচ্ছন্দ?

বিষয়টি একান্ত ব্যক্তিগত হওয়ায় স্পর্শকাতর। 'শৃঙ্গার' স্বীকৃত রস, তবু এর যথেচ্ছ ব্যবহারে আমার একটু কুণ্ঠা রয়েছে। যদিও শরীর আমার কবিতায় জাগ্রত সত্য। 'বিকল্প যৌনতা' কথাটা অবশ্য আরোপিত লাগছে। নিতান্ত মাথামোটা না হলে সকলেরই বোঝা উচিত সমকামিতা মানুষের অন্যতম স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি। সমকামনার বোধহীন মানুষ কিন্তু ভয়ংকর।

***বোধশব্দ*-রই 'কবিতা যেমন দেখায়' সংখ্যায় তোমার *দেখা না-দেখায় মেশা* প্রবন্ধে তুমি লিখেছ, '...দুনিয়াজোড়া গড় কবিতা কিন্তু রোগা ছিপছিপে লম্বাটে গড়নের। আর সেই জন্যে গোলাপ কিংবা কবিতা দেখামাত্রই কিন্তু চিনে ফেলা যায়। যদি আমি চিনে গিয়ে লিখিত কিংবা ছাপার হরফে ওরকম চেহারার কিছু দেখি, আমার অন্তত প্রাথমিকভাবে ওটিকে কবিতা বলেই প্রতীতি হবে, হবেই।' কবিতার এই বহিরঙ্গ তথা কৃৎকৌশল নিয়ে তুমি কতটা সচেতন?**

ভীষণ সচেতন। দু-মুঠো বালি জড়ো করে একটা শিশু সেটাকে বাড়ি বলে দাবি করলে কেউ না করবে না। কিন্তু ছবিতে, কবিতায়, শিল্পে তা হওয়ার নয়। একটি কবিতা কিংবা একটি ছবির ভৌত রূপটি ওই শিল্পবস্তুটির আঙ্গিক ও বিষয়ের জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার অন্তিম ফসল।

***পরিধি*-র বিন্যাস ও সজ্জা তোমার অন্য সমস্ত বইয়ের থেকে ভিন্ন ও ব্যতিক্রমী। এমন সজ্জার পিছনে তোমার যুক্তি কী ছিল?**

পরিধি-র লেখাগুলি যখন হচ্ছে, তখন যে মনোভঙ্গিটি সক্রিয় ছিল তাতে করে লেখাগুলি ওরকম আকার নেয়। সংখ্যা চিহ্নিত ছোটো ছোটো লেখার দীর্ঘ মালা। হোস্টেল ছেড়ে বাস্তবতর একটা প্রেক্ষাপটে পা রেখেছি। *বৃত্ত*-এ রয়েছে অন্তর্গত ব্যক্তিজগতের কথা আর *পরিধি* অংশ ধাবিত হয়েছে বহির্জগতের দিকে। একত্রে *পরিধি*। ফলত, অনিবার্যভাবেই ওরকম একটি অবয়ব সম্ভবপর হয়।

প্রথম বই *হাওয়া বাড়ি* ছাড়া বাকি তিনটি বইয়ের প্রচ্ছদ তোমারই আঁকা। নিজে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকার সুবিধে ও অসুবিধেগুলি কী কী?

পরিধি কালি-কলমে, *মেধাবী নির্জন* জল-রঙে। দুটোই ড্রইং। *ব্যাচেলারস জোকস*-এর জন্য আলাদা করে প্রচ্ছদ করিনি। নিজের একটি অ্যাক্রেলিক পেন্টিং প্রচ্ছদে ব্যবহার করেছি। আসলে *ব্যাচেলারস জোকস*-এর লেখা যখন চলছিল, তখন এই *হান্টার* সিরিজের ছবিগুলোও আঁকা চলছিল। দুটোর মধ্যে পারস্পরিকতা থাকায় ছবিটিকে প্রচ্ছদ করে নিয়েছি। নিজের জামাকাপড় নিজে কেনার যে সুবিধে, নিজের বইয়ের প্রচ্ছদ নিজে করার সুবিধেও সেটাই। আমার লেখা— তার রচনাপ্রক্রিয়া আমার সর্বাধিক চেনা। তাই কোন জামায় তাকে মানাবে আমারই বোঝা উচিত বেশি। আমার ছবি পাঠক দেখুক— এটাও চেয়েছি।

আর, *হাওয়া বাড়ি*-র প্রচ্ছদ করেছিল অরিন্দম। প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন্দ্রিক আমাদের সমবেত শিল্পযাপনের আড্ডা, তার অন্যতম শিল্পীসদস্য শমীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। দু-জনই এখন খ্যাতিমান শিল্পী। অরিন্দমের আঁকা *হাওয়া বাড়ি*-র প্রচ্ছদটি আমার অতি প্রিয়। তখনও অরিন্দম বিখ্যাত হয়নি। আসলে ওই সময়টা ছিল যৌথতার, সমবেত উল্লাসের। খুশিগুলো ভাগ করে নেবার দিন। আমার বই যেন আমার নয়, সবার। এমন দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

বই কোথা থেকে প্রকাশ পেল, বইয়ের বহিরঙ্গের রূপ অথবা তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তোমাকে কতখানি ভাবিত করে? প্রাতিষ্ঠানিকতা ও সৎকবিতার মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে কর কি?

শিল্প সমাদর প্রত্যাশী। শিল্পী সম্মান চায়। সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে ও সৃজনশীল মনটিকে অকলুষ রাখতে পারার দৃঢ়তাটা জরুরি। ভ্যানগঘের ছবি বাণিজ্যসফল এবং স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। জীবনানন্দ বাণিজ্যসফল এবং প্রতিষ্ঠান। এই রাজকীয় উচ্চতা যেকোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের ভবিতব্য। এতে লজ্জা পাবারও কিছু নেই, ভয় পাবারও কিছু নেই। ধান খেতে চিত্রপ্রদর্শনী করে কিংবা আর্ট গ্যালারিতে ধান চাষ করে কিছু সুবিধে হবে কি? সূর্য পুব দিকে ওঠে বলে আর শিল্প শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বলে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদার কি আছে?

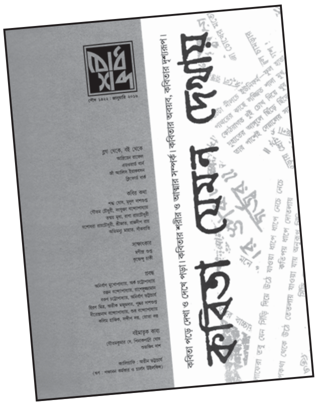
তোমাদের অকালমৃত বন্ধু অচ্যুত মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ *একটি তারার তিমির*। ওই বইয়ের লেখাটিতে তুমি কবি অচ্যুত মণ্ডলের নিজের জীবন নিয়ে জুয়োখেলা এবং সচেতন স্বেচ্ছাকৃত অপচয় ও অনুৎপাদনকে গৌরবান্বিত করছ। অপচয়ের এই গৌরবায়ন কি তোমাদের অন্যতম যুগচিহ্ন ও সমস্যা নয়? এই কারণেই কি

প্রবীর দাশগুপ্ত বিপ্লব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিতা লেখেন, তুমিও বাধ্য হও প্রবীর দাশগুপ্ত কিংবা অচ্যুত মণ্ডলকে নিয়ে লিখতে? একই কারণে কি তোমার কবিতাও সংখ্যায় এত কম, ছবির প্রদর্শনী হাতে-গোনা? আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে এ-বিষয়ে কোনো অনুশোচনা হয় কি?

না, আমি ঠিক গৌরবান্বিত করিনি। আমি জাস্টিফাই করতে চেয়েছি। তবে আমাদের সময়ের যে-মুখটি তুমি নির্মাণ করতে চাইছ, তার সঙ্গে আমি খানিকটা একমত। আসলে আমাদের প্রজন্ম এই দেশকালের প্রেক্ষিতে বড়ো সুখী প্রজন্ম। এদের জন্ম থেকে প্রথম যৌবন কেটেছে বাংলার অন্যতম সুস্থির সময়ে। কিন্তু তার ঠিক পরেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নাটকীয় ও নারকীয় পরিবর্তনগুলি ঘটতে থাকে, তার সঙ্গে এরা তাল মেলাতে পারে না। ফলে তৈরি হয় বিতরাগ— দূরত্ব, নানা ধরনের প্রস্থান। আর, নিজের জন্য আফশোস হয় বই কী! তবে অকারণে কিংবা স্রেফ সাংস্কৃতিক কারণে লেগে থাকাটাও হাস্যকর।

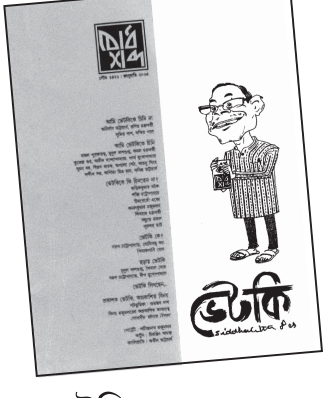
আজকের বাংলা কবিতা যুগযন্ত্রনা ও সময়ের বিশিষ্ট অভিজ্ঞানগুলি প্রকাশে কতটা সমর্থ হচ্ছে বলে তুমি মনে কর? নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-চাহিদাতাড়িত এবং প্রযুক্তিবেষ্টিত এই সময়ে কবিতার মতো কলামাধ্যমের উপযোগিতা আদৌ আছে কি?

কে লিখছে, কেন লিখছে, কাকে লক্ষ করে লিখছে— সবকটাই খুব তালগোল পাকানো। কবি-শিল্পীদের অবস্থাটা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত আর্টিজানদের মতো হয়ে যাচ্ছে। আজ এ-মেলা কাল সে-মেলা— এই সাংস্কৃতিক হুজ্জুতি, একরকম গুন্ডামিই বলা যায়— এইসব করে কখন লিখবে, কীভাবে আঁকবে? আমার ধারণা, শিল্প-সাহিত্য তার অন্তিম উচ্চতা স্পর্শ করে ফেলেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এসবের বিশেষ উপযোগিতা নেই। শিল্পের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে ধ্বংস করাই হবে আগামী দিনের বড়ো শিল্প। আমাদের মতো প্রাগ্রসর মানুষের সফল সহযোগিতায় শাসকশ্রেণি এই জেনেটিক পরিবর্তনটা অবশেষে ঘটাতে পেরেছে।



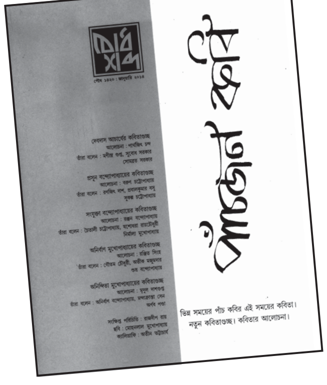
কবিতা যেমন দেখায়

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৬



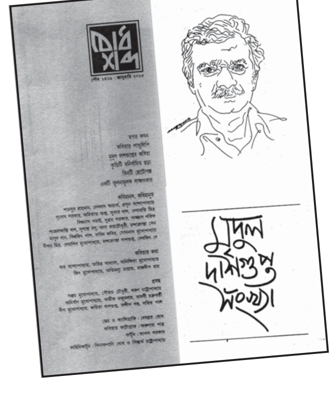
ভেটকি

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৫



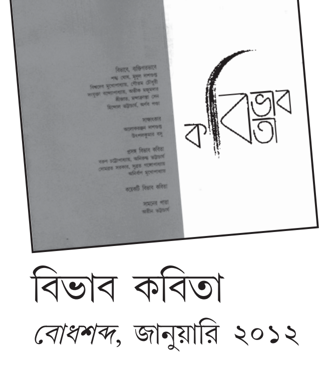
পাঁচজন কবি

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৪



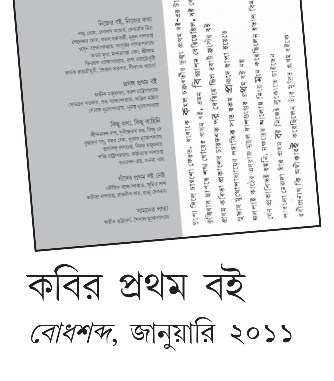
মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১৩



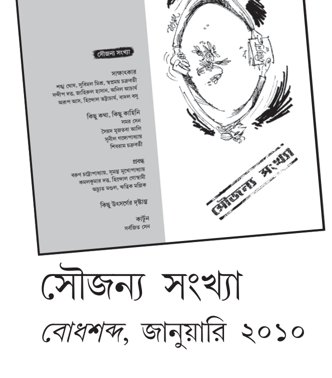
বিভাব কবিতা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১২



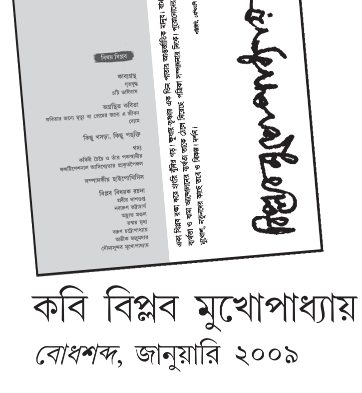
কবির প্রথম বই

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১১



সৌজন্য সংখ্যা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১০



কবি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

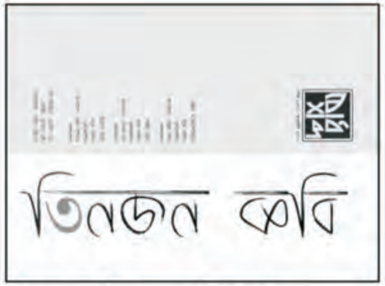
বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৯



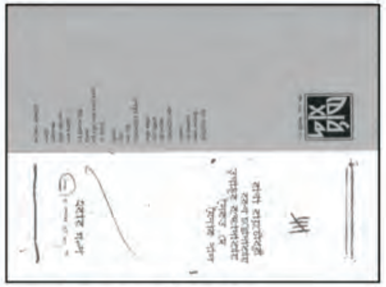
কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১



পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪



তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭



এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯



সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০



মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩



কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬



কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮



বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯



বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২



ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫



অরূপ আস

সংগীত, নাটক, সিনেমা... আরও বহুবিধ মাধ্যমও কবিতার নিকট দোসর। সাতের দশকে দূর মফস্‌সল থেকে কলকাতায় একা একা নাটক দেখতে আসা কিশোরবেলাতেই মনে হয়েছিল তাঁর। ধীরে ধীরে যাতায়াতের ট্রেনবাসহাঁটাপথেও উদ্দীপন বিভাব আবিষ্কার। কবিতা লেখা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখে চললেও আজ পর্যন্ত অরূপ আসের (জ. ১৯৬১) কোনো কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর কবিতার পরিমাণ এত কম নয় যে তা-দিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ তৈরি হতে পারে না। একাধিক উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন, নিজস্ব কবিতাভাষ গড়ে উঠেছে, অথচ প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক লেখাই ছাপা হয়েছে পাড়ার কোনো অনামি পত্রিকা কিংবা নিছক পুজোর স্যুভেনিরে। ইদানীং তাঁর কবিতা তো আরওই চোখে পড়ে না। এর কারণ হয়তো কবিসত্তার সঙ্গে সম্পাদকসত্তার দ্বন্দ্ব। কুড়ি বছর হল নিয়মিতভাবে তিনি সম্পাদনা করে চলেছেন *তাঁতঘর একুশ শতক* পত্রিকাটি। বীরেন ভদ্র, ব্রজেন দে কিংবা জ্ঞান গোঁসাই— এমন বহু ব্যতিক্রমী ব্যক্তি ও বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে তাঁর পত্রিকা। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে সম্মানিতও হয়েছে।

তাঁতঘরের এই বুননেই যেন-বা অন্য এক কবিতা লিখে চলেছেন তিনি...

নতুন কবিতা

নতুন কবিতা

হেমন্ত

স্মৃতি : গ্যালারি গোল্ডে বাংলা খেয়ালের আসর

ভাঁড়ারের অতল থেকে
নীরবে হেমন্ত আসে
নগরের গাঁয়ে

অরণ্যের চেয়ে আরও
পুরোনো অরণ্যের দিকে
ভেসে যায় পোস্টম্যান
শব্দের মায়া
খাঁ সাহেবের বিস্তার
ঠাকুরের গান
আজি বরিষন মুখরিত...

সিক্ত নীরব প্রাণে ভরে ওঠে
উৎকর্ণ জাজিম
ধ্বস্ত ত্যক্ত ত্রস্ত
যাপনের থেকে বহু দূরে
সুরমণ্ডলের বুকে
আরও এক দৃশ্যের জন্ম...

বাংলা খেয়ালের কোলে
মাথা রাখছেন কবীর সুমন।

সেলফি মানে নিজস্বী

এই আমি তুলে রাখছি
যাবতীয় খানাখন্দ কাঁটাঝোপ
সবেদাবাগান...

প্রত্নমনের গভীর থেকে
তুলে এনে সাজিয়ে দিচ্ছি
বৈঁচিফলের মালা
আলো নেভা আকাশপ্রদীপ

না, আমার একটুও হাত কাঁপছে না
এখন আমি জেনে গেছি
ফ্রন্টক্যামে কোনো অশ্রুগ্রন্থি থাকে না!

সংলাপ

মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের রং মাখা ঠোঁটে
যে-সন্ধ্যে থমকে আছে
আমি তাকে বলি
যাও ঘরে যাও

সিন্ধু-বাঁরোয়ায় যতই তান লাগুক
আজ আর কেউ আসবে না

ওবেলার ভিজে ভাত
কাঁচালঙ্কা-ঘষা মৌরলা মাছের টক...

পোনাঘাট পেরিয়ে আসা পৃথিবীটা
খুব-একটা খারাপ জায়গা না

যাও ঘরে যাও
সরণির বিধান মেনে
ট্রামের ঘণ্টার পিঠে
আবার সকাল আসবে

তোমাদের নতুন সংলাপ

স্টেশন মালতীপুর

থিম-পুজোর প্যান্ডেল ছাড়া আজও যাদের দেখা হয়ে ওঠেনি, বাংলার মুখ— আপ হাসনাবাদ লোকাল থেকে একদিন অকারণ নেমে পড়ুন স্টেশন মালতীপুর। নদী মাঠ ভাঁটফুল। পুবের আলপথে হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখুন পাটকাঠির জোরেল দিয়ে তৈরি ধীরাজ চৌধুরীর ইনস্টলেশন। জীর্ণ বাঁশতলার পাশ দিয়ে কলহাস্যে রাজহাঁস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন— উনি চাঁদবিবি। আর ঘোড়ানিমের গায়ে ঠেস দিয়ে শারিন্দা হাতে গান ধরেছেন উনার লাভার! মনসুর বয়াতি। পাশের জলকরের উপর দিয়ে ওই যে উড়ে গেল ওটাই শামুকখোল। কী খিদে খিদে লাগছে? দাওয়াত ছাড়াই রাংচিতার বেড়া টপকে ঢুকে পড়ুন মা ফতিমার নিকোনো উঠোনে। গোটরা চালের গরম গরম ফ্যানাভাত, মুক্তকেশী বেগুন পিঁয়াজকলি আর কাঁচকি মাছের ঝাল। শেষপাতে পাকা কয়েতবেলের আচার। না, ছবি তুলে হোয়াট্‌সঅ্যাপ করার চেষ্টা করবেন না। চলুন, এবার ফিরতে হবে। বেলা পড়ে আসছে। মুসল্লিরা নমাজে বসবেন।

আর হ্যাঁ, ট্যুরগাইড অনলাইন বুকিং
এসব নিয়ে একদম চাপ নেবেন না
মন শুধু মন মনে রাখুন
মানস ভ্রমণে কোনো টিকিট লাগে না।

পূর্বপ্রকাশিত

গতরাতের স্বপ্ন

দাম্পত্য কলহে স্ত্রী মনে ব্যথা পেলে স্বামীর দণ্ড
— সুপ্রিম কোর্টের রায়

ভাঙন ধরানো পদ্মাপাড়ের গ্রাম
আমবন আর ইলিশের নোনা গন্ধ
হ্যাজাক বাতির তলায় রহিমপুরের আলকাপ
নাকছাবিতে জোনাকির আলো নিয়ে
ভিড়ের মাঝে বসে আছো তুমি

মেছুনির মেয়ে
আর আমি
চাঁই মোড়লের নিজের হাতে তৈরি
আলকাপের ছোকরা
মানুষের বউ-বাচ্চাদের
দাম্পত্যকলহ সুরে বেঁধে
নেচে চলেছি... নেচে চলেছি...
নাচতে-নাচতে আমার ঘুঙুরের ধ্বনি
পেরিয়ে চলে বছরের পর বছর
বছরের পর বছর
এরই মাঝে কার্জন সাহেব তার
কলমের ডগায়
বাংলাদেশকে চিরে দু-টুকরো করে
দিতেই

ঠাঁইনাড়া হয়ে আমি
বিল-ঝিল, আঁদার-পাঁদার,
শাপলা-শালুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বছরের পর বছর
বছরের পর বছর পেরিয়ে
জোব চার্নকের কলকাতায় পৌঁছে দেখি
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
নারী সমিতির মিছিল
আর তাদের সকলের হাতে
পতাকার বদলে ঝুলছে
আমার প্রত্যেক স্বামীজন্মের
এক-একটা ধড়হীন মুণ্ডু

আয়ুষ্মতী

কোয়ার্টজ মোরগের ডাকে
চাষিবউ ঘুম ভেঙে দেখে
ঘরের পুরুষ গেছে পরাগসংযোগে, পটলের খেতে

রজনীর সহস্র পেরিয়ে
কত শত ভোর যেন আজ
উঠানের নৈর্ঋতে বোবা নিম ডালে বসা কাক
কীটনাশকের খালি শিশি হাই তোলে...

এইখানে এসে, খানিক থমকে গিয়ে
পদকর্তা দৃশ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন—

আর এই ফাঁকে, চালের বাতায় গোঁজা
সন্তোষী পাঁচালির পিঠে
আয়ুষ্মতী লিখে রাখে

জামাই-কার্তিক তুমি
ভাদ্রের কামড় মেনে যাবে আনবাড়ি
গোপালের এত ক্ষীরনাড়ু
কার জন্যে তুলে রাখব ঠাকুরপো এবার?

ঢোল নাচ ও করতালি

কই গো মা জননী দরজা খোল আমরা এসে গেছি
গোপালকে একটু কোলে এনে দাও— নাচাই... উঁহু
মুখ ফিরিও না মা গো জগৎ আঁধার করে এসেছি
তোমাদের দুয়ারে আমাদেরও বাপ মা ভাই বোন ছ্যালো
মা গো গোপালের বাবা কোথায়... ৫০১ টাকার কম
দিও না লাইগেশনের বাজার... মেয়েগুলো মদ্দাদের সাথে
পাছা দুলিয়ে আপিসে যায় সহজে মা হতে চায় না...
ছেনাল... আমাদেরও খিদে আচে মা একাদশী
পুন্নিমে আছে... আর একপালি চাল বেশি দাও
গোপালের মা... আমরাও মানুষ মা গো পিঠে ঘামাচি হলে
চুলকায়... জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া খেতে
ইচ্ছা করে হ্যাঁ গো মা বিশ্বাস করো
ভোটবাবুদের খাতায় আমাদেরও নাম আছে...

সজিনা বিষয়ক গবেষণাপত্র

সজিনা ফুলের বিশেষ কোনো গন্ধ নাই। কেবল 'পরজের বিহ্বল মীড়' যখন প্রকৃতির সেতারে ঝালাইয়া উঠে, তখন তাবৎ গৃহস্থের হৃদয়ে ঝরা সজিনার জন্য শোক উপস্থিত হয়। যদিচ এ বিষয়ে গবেষণাপত্র রচনার কথা অদ্যাবধি শোনা যায় নাই। যাহা জানা গিয়াছে, তাহা হইল— কেহ কেহ সজিনার কচি ফুলভাজা সহযোগে গরমভাত এবং কেহ কেহ হরিদ্রাভ সরিষা-মাখা সজিনা ডাঁটার ঝাল সবিশেষ পছন্দ করেন। অপিচ অন্যেরা সজিনার কাণ্ড-শাখা-প্রশাখায় শুঁয়াপোকার অপরিকল্পিত পরিবারবৃদ্ধির আশঙ্কায় সজিনা সৃজন হইতে বিরত থাকেন।

এবংবিধ তথ্যাবলি ব্যক্তিগত যন্ত্রগণকে বিশ্লেষিত করিবার পর, মদীয়ের এই প্রতীতি জন্মাইয়াছে যে— সজিনার ফুল, সজিনার ডাঁটা ও শুঁয়াপোকা— ইহা অপেক্ষা, ইহ পৃথিবীর মানুষ-মানুষীর অধিক কোনো গল্প নাই!

৮ই মার্চ সৌদামিনী দাসী যা বলবেন

ওই যে গো বোসেদের ধিঙ্গিটা... হাতকাটা
ব্লাউজ, নাই-বার-করা শাড়ি, কাঁধে ব্যাটাছেলেদের
মতো ঝোলা ব্যাগ... আমাকে বলে কিনা—
মহিলাদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে সভা হবে, মিছিলে
চলুন... বোঝো কাণ্ড, পানপাতা সরিয়ে পুরুষের
মুখ দেখেনি... বিছানায় ভিজে কাঁথার গন্ধ শোঁকেনি
...খিচুড়িতে মুগ-মুসুরের মিশেল জানে না...
সে বুঝবে মেয়েমানুষের কষ্ট... এই যে রাত
থাকতে উঠে খোকার বাপের জন্য ভাত রাঁধি...
সদু আরেকটু চচ্চড়ি হবে... মাস পয়লায় সেই
মানুষটাই বেশি রাতে বাড়ি ফিরে গায়ে হাত তোলে,
খিস্তি দেয়... সকালে উঠে ব্যাগ থেকে ছেলের
দুধ, আলতার শিশি বার করে বলে— ওগো শুনছো...

কী রে, এসবের কিছু বুঝিস তুই, ছেমরি?

মায়ার সংসার

খনার বচনে ক্যালেন্ডারের তিথি বদলায়
হেম না বকেয়া ভুল সুচে গাঁথা কদম মুকুল
কোলবালিশের পেটে পেটে তুমি এত শয়তান
পাপোশের নীচে ঘাপটি লুকিয়ে পুণ্যিপুকুর
ব্রতের আখরে ভুল ভুল ভুল আর দম নেই
কাশতে কাশতে শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলতার রং
ডালের ফোড়নে হেসে ওঠো তুমি ফ্রয়েড না য়ুং?

হরুঠাকুরের পাঁচালি

ছ্যাঁচা দরমার ফাঁকে
খালেদ চৌধুরীর কারুকাজ
মাটির মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছেন
তাপস সেন...

সর্বজয়া :
বোশেখ শেষ হতে চলল
আজও কোনো কাজের ডাক নাই...
(সাউন্ডট্র্যাকে তৈজসপত্রের পত্রের ঠোকাঠুকি)
ফেড আউট

পর্দা জুড়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভর্তি
হরিহরের মুখ— বিড়বিড় করছে
জায়ফল চারটে জয়িত্রী পঞ্চাশ গ্রাম
ক্যাওড়াজল এক শিশি

ফেডইন
দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে
পাশাপাশি অপু-দুর্গা
কাঠের উনুনে ফুটন্ত হাঁড়ির দিকে
ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছেন সর্বজয়া...

ক্লোজ শট
ক্যানাস্তারার পিঠে আলকাতরায়
লেখা সাইনবোর্ড
বাতাসে অল্প অল্প দুলছে
বিবাহ-অন্নপ্রাশনে আসেন
হালুইকর হরিহর ঠাকুর

পুনঃ চিল্লী চিখেন যানা আছে

হাবাগোবা লোকের গল্প

হাবাগোবা লোকেরা ধার করে বাড়িতে টিভি কেনে,
কিন্তু নিজে দ্যাখে না।
শুধু মাঝে মাঝে ছুটির দিনে
ছাদের মাথায় অ্যানটেনাতে মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে
শেষ পৌষের বিকেলে হাবাগোবা লোকের বউটি যখন
তার ফুটফুটে কিশোরী কন্যাটিকে নিয়ে
দাঁড়ায় তাদের সামান্য বাগানে, ঠিক তখন হাবাগোবা লোক
মাথা নিচু করে বেগুনগাছের মাটি আলগা করে
কেরোসিনের লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়
আলাদা হয়ে যাওয়া ভাইয়ের ছেলের
শরীর খারাপের খবর শুনে, মনে মনে খুব
মন খারাপ করে,
এইভাবে চিরকাল, হাবাগোবা লোকেরা
হাবাগোবা হয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে।

কাঁদো নদী কাঁদো

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য : অদ্বৈত মল্লবর্মন

ইতিহাসের কেতাবে কোনো নাম নেই
ভূগোলের পাতায় কোনো স্থান নেই
ও তিতাস, তোমার নদীর নাম
মন্দস্রোতে ভেসে যাচ্ছে
মাঘমণ্ডলের চৌয়ারি
সুবল কিশোর আর দীননাথ মালোর
মেয়ে বাসন্তীর গল্পে
চোখ মুছছে ঋত্বিকের ক্যামেরা...

২

গোকর্ণঘাট থেকে কলিকাতানগরী
সংবাদপত্র থেকে সাহিত্যের দেশ
কারুবাসনার টানে নিরন্তর রাত্রি জাগরণ...

পরিজনের পাতে দিনান্তের মাধুকরী
ফুসফুস ইজারা নেয় ক্ষয়ের জীবাণু...

গোকর্ণঘাট থেকে কলিকাতানগরী
সাঁইত্রিশ বৎসর তিনমাস পনেরো দিন

ও জীবন, হে জীবন
এত ছোটো কেনে?

৩

শত বরষের পরে
চৈত্রে লিখিত এই
জীবনতৃষ্ণার গাথা
তুলে রাখি বসন্তের পাটাতনে

ও তিতাস
জোকার দেও... জোকার দেও...

কাঁদো নদী কাঁদো

ভাঙাগান

মরার সময় নেই আজ রবিবার
সুর-ফাঁক তালে বাজে প্রতিভার জ্ঞাতি ভাইবোন
প্রেম পূজা বিচিত্র পর্যায়

দুপুর খুঁড়িয়ে হাঁটে বিকেলের দিকে
সাদা দাড়ি, বসে যাওয়া গাল
খাতা-ভরতি ঠাকুরের গান ভাঙাগান

চলে যায়, মরি হায়, মরার সময় চলে যায়...

ভূমিপুত্র

সুন্দরীর ঝোপ থেকে ভেসে আসা বড়োকুটুমের ডাকে
সাদা থান কার বউ স্বপ্নে ছোটে ইন্দ্রের সভায়...
কার ছেলের মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত
আজও জাগে কামটের পেটে...
কার বাপ মধু আনতে
নিজেই মক্ষিকা হয়ে বনবিবির থানে...

সেসব কান্নার জলে যত নুন
গরানের শ্বাসমূল কিছু তার জানে
আর জানে সেই লোক—

রাজনীতির তত্ত্বকথা চালের বাতায় গুঁজে রেখে
রাঙাবেলিয়ার গ্রামে
সৌর লণ্ঠনের আলোয় মাথা নিচু
ওই তিনি
জল-জঙ্গলের কাব্য লিখছেন
ভূমিপুত্র শ্রীযুক্ত তুষার কাঞ্জিলাল।

এখন আমরা জুনিয়র আর্টিস্ট

'মোর দুঃখের গান কত গহীন
ক্যামনে বুঝবা তোমরা?'
— *তিতাস একটি নদীর নাম*

কলোনির খুপরিতে নিশিরাত
দেয়ালে টাঙানো বাঁকা চাঁদ
যমুনা বড়ুয়া

আমিও তোমার মতো...
হই না হব না কোনোদিন
খিদে শুধু খিদে আর খিদে

মাসে দশদিন কাজ
কাঁচুলিতে অভ্রকুচি
হোলিদোল পথের ভিখিরি
অ্যাক্টো নাই অভিনয় নাই শুধু
গোপন প্রস্তাব হাতে ফ্লোরম্যানেজার...

খিদে শুধু খিদে আর খিদে

কলোনির খুপরিতে নিশিরাত
লাইট-সাউন্ড-ক্যামেরা...
কাকজ্যোৎস্নার ফ্রেমে
মোদের প্রতিটি স্বপ্ন এন জি হয়ে যায়।

ত্রিবেণী

‘ত্রিবেণী তীর্থ পথে
কে গাহিল গান’
ক্যাসেট-দোকানে বাজে
বাবা সেহেগাল
জানি-জানি
কলস-ভরতি চৈত্র মাস কাঁখে
আর বাঁকে-বাঁকে বয়ে নিয়ে
হেঁটে যাচ্ছ... হেঁটে যাচ্ছ...
ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে
‘তর্ক পঞ্চানন’ তোমাকে শ্লোক শোনাচ্ছেন
সাহেবের দেওয়া
গন্ধ সুবাস মাখা পুঁটুরানি
তোমাকে অভয় দিচ্ছেন
সীমান্তের ওপার থেকে হাওয়া এসে
কানের লতির পাশে ফিসফিস
তাকা, সামনের দিকে তাকা
আর তুমি কল্যাণী
পালাপার্টির ছোকরা বামুনের নামাবলির গায়ে
একমনে লিখে যাচ্ছ
তোমার সমস্ত ডাকনাম
তোমার পায়ের নীচে
ধুলোবালি— পোড়া খই— অচল আধুলি
মানে তোমার সব জন্মের তুতো ভাই-বোন
হাততালি সমেত ঐকতানে বেজে উঠছে
ত্রিবেণী তীর্থ পথে কে গাহিল গান...

রবিবারের সকাল

‘বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতোন সাবধানে তোমার প্রসঙ্গে আসি’
— বিনয় মজুমদার

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাবার মধ্যে গৃহস্থ লাউডগার মতো মাথা তোল তুমি। তোমার কানের মাকড়ি থেকে ঠিকরে পড়া চকমকির ক্ষীণ আলোয় সেনেটোরিয়ামের বারান্দায় ঝেঁপে বৃষ্টি নেমে এল আর অবধারিত শ্বাসকষ্টের আগাম পূর্বাভাস বুকে নিয়ে আমি পথে নামলাম। চোরকাঁটা আর সেঁকুল কাঁটা, জলশিরীষ আর আমলকি, রাধাচূড়া আর হনুমানলাঠি চিনে নিতে নিতে আমার মেরুদাঁড়া ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকল। নিরুদ্দিষ্ট চাকার দাগ দু-টি খুঁজে পেতে দু-হাতের তালুর জটিল কররেখার দিকে তাকাতেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, নির্দিষ্ট বাঁকের মুখে, সচকিত মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছ তুমি, রবিবারের সকাল।

সমুদ্র থেকে ফিরে

সমুদ্র থেকে ফিরে আসার পর
মানুষ কিছুদিন
ঝিনুক-বালিয়াড়ি-নুলিয়া
এইসব কথা বলে থাকে
তারও বেশি কিছুদিন
তার চুলে
নুনের গন্ধ থেকে যায়

নুন। কবিতার অন্ত্যমিল ঠিক রাখতে
যা কিনা কখনো-কখনো
লেখা হয় লবণ
হঠাৎ কখন মিশে যায়
তার রক্তে, অশ্রুতে...

এরপর একদিন
রাত্রির মধ্যযামে
তার সারা শরীর থেকে
প্রচণ্ড গর্জনে জেগে ওঠে
একটা আস্ত সমুদ্র।

দৃশ্যটা এমন কিছু নয়

দৃশ্যটা এমন কিছু নয়
সিটের কোণে রুমাল ফেলে
নেমে যাচ্ছে মেয়েটি
এই যে শুনছেন... এই যে আপনার
এই যে...

মরালীর মতো গ্রীবা বাঁকিয়ে
মাত্র একবার পিছন ফিরেই
ফুটপাতের জঙ্গলে মিশে গেল মেয়েটি

কনডাক্টরের বচসা, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর
বিজ্ঞাপন-বণিতার অপসৃয়মান মুখ...

সবকিছু আগের মতোই ঠিকঠাক

শুধু পাশে বসা তরুণটি তখনও
পড়ে থাকা রুমালের গা থেকে
অতি দ্রুত টুকে নিচ্ছে,

পরবর্তী কবিতার লাইন।

পারফেক্ট কোচিং সেন্টার

(মাধব দত্ত এমএ, বিএড। প্রতিভা সেন (দত্ত) বিএসসি, বিএড।)

মাধব স্যার
মনে করুন আপনি গোবর গুহের বাইসেপ্‌স
মনে করুন আপনি চায়ে তিন চামচ চিনি
মনে করুন আপনি গোষ্ঠ পালের খালি-পা
মনে করুন আপনি ধবধবে টাটা সুমো
শাহরুখ খান

প্রতিভাদি
মনে করুন আপনার ঝুলপিতে কোনো রুপোলি চমক নেই
মনে করুন আপনি আরামবাগ চিকেনের শো-কেস
মনে করুন আপনি হেমেন মজুমদারের তেল রং
মনে করুন আপনি বেগম রোকেয়ার তুতো বোন

মনে করুন আপনাদের ছাত্ররা সব বেড়াতে গেছে
হেসাডির জঙ্গলে
মনে করুন আপনাদের কোচিংয়ের গেটে আজ
প্রচুর চাঁপা ফুটেছে
মনে করুন আপনাদের উঠোন জুড়ে তুমুল বেজে উঠছে
হিজড়েদের ঢোল

না থাক, ওটা আপনারা আর কখনো মনে
করতে পারবেন না।

উঠি না উঠি

আমাদের গাঁয়ে মাত্র একটা শিবরাত্রির মেলা
মেয়ে ইস্কুলের ঝোপে থোকা থোকা আকন্দ ফুল

আমাদের গাঁয়ে মাত্র একটা পঞ্চায়েত আপিস
রক্তবীজের ঝাড় কয়েকশো ভুখা পেট

আমাদের গাঁয়ে মাত্র একটা শ্মশান
মোরাম রাস্তায় রোজ হিজড়েদের ঢোল

আমাদের গাঁয়ে কোনো নদী নেই

আমাদের গাঁয়ে কোনো ডাকঘর নেই

আমাদের গাঁয়ে কোনো কামারশালা নেই

পুনঃ আমাদের গাঁয়ে আছে কানু পাগল,
একমাত্র পোয়েট

গৃহপালিত

নিঝুম সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা ওগো
তোমার ওষ্ঠে কয়টি তিল?
কণ্ঠনালিতে কে
লম্পটিয়া হাছনের গান

শুভঙ্করীর আর্যা গুনে গুনে
আজও তুমি ফিরে ফিরে...

জলশিরীষের ডালে থমকানো বিকেল
না রে, সাপলুডো খেলতে আমার ভয় করে

বুকের বাঁ দিকে কষ্ট হচ্ছে
একটু জল খাবে, বাবাজীবন?

গল্পের বাকি অংশ

শুরুটা এইরকম—
৮টা ১০-এর লোকালে মানস জয়তির জন্যে অপেক্ষা করে
জুলজি-ল্যাবে মণীশ নিজের আঙুল ফুটিয়ে রক্ত দেয়
শম্পার স্লাইডে
রিডিং-রুমে চৈতালির চুড়িদারের ওড়না থেকে
জুঁইফুল তুলে কবিতার খাতায়
জমা করে জয়দেব

দৃশ্যান্তরে দেখা যায়
নিজের টিফিনবাক্স থেকে শম্পা পরম মমতায়
চাউমিন তুলে দিচ্ছে মানসের মুখে
ক্লাস পালিয়ে 'আকেলে হাম আকেলে তুম'-এর লাইনে দাঁড়িয়ে
একসাথে ঘামছে মনীশ আর চৈতালি
ক্যান্টিনের পলেস্তারা-খসা দেওয়ালে হেলান দিয়ে
জয়তি একমনে জয়দেবের কাছে শিখে নিচ্ছে
স্বরবৃত্ত ও কলাবৃত্তের করণকৌশল

এমনি করে মানস-চৈতালি-জয়দেব-শম্পাদের গল্পের গরুরা গাছে ওঠে... গাছ থেকে নেমে এসে ঘাস খায়... জাবর কাটে এবং গল্পের বাকি অংশ পরের দিনের প্রভাতি দৈনিকের হেডলাইন হয়ে জেগে ওঠে।

অরূপ আসের এই কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত।
কবির অনুমতিক্রমে এখানে সংকলিত হল। — সম্পাদক

আলোচনা

চলমান অশরীরী

মৃদুল দাশগুপ্ত

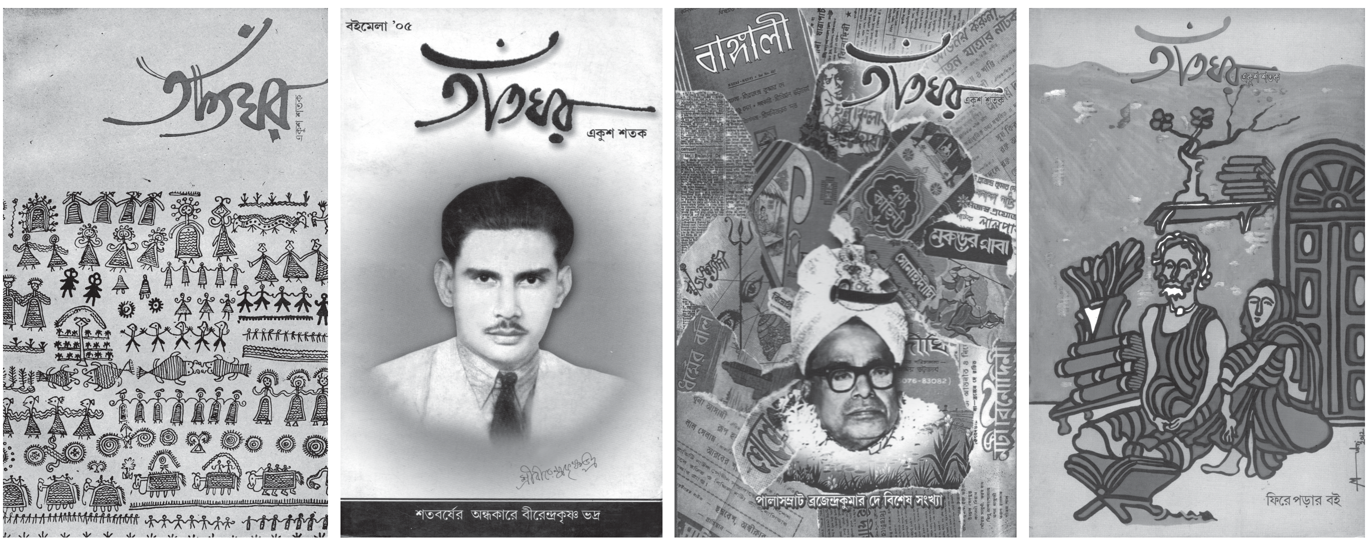
একটু আশ্চর্য হচ্ছি এই যে, দু-তিন রাতে আমি সুস্নাতর কাছ থেকে পাওয়া অরূপ আসের কবিতাগুলি পড়ব মনস্থ করে, পয়লা রাতটিতেই বিবিসি-র সংবাদ চ্যানেল খুলে বসলাম। বিশ্ব-সংবাদ হচ্ছিল না। একটি অনুষ্ঠান দেখাচ্ছিল, ভারতে চলমান সিনেমা দেখানো সংক্রান্ত নিউজ স্টোরি। দেখতে দেখতে মনে পড়ল, আমরা যখন ছোটো, কলকাতার হাতায় আমাদের শহরটিতেও ভ্যান রিকশায় বা ছোটো গাড়িতে প্রোজেক্টর মেশিন এনে মাঠে সাদা স্ক্রিন টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হত। শহরে, গঞ্জে ঘুরত এরকম সিনেমার গাড়ি। মাহেশের রথের মেলাতেও রঙিন কাপড়ের তাঁবুর ভেতর এরকম সিনেমা দেখানো হত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন এভাবে প্রোজেক্টর মেশিন, ফিল্ম, স্ক্রিন পাঠিয়ে *পথের পাঁচালী* ছবিটিকে আমাদের শহরে একাধিকবার দেখিয়েছে। আমি শ্রীরামপুর স্টেশনের পিলখানায় সত্যজিৎ রায়ের এই পয়লা ছবিটি দু-বার দেখেছি। বিবিসি দেখাল তামিলনাড়ুতে, অন্ধ্রে এখনও গাঁয়ে, গঞ্জে সিনেমার গাড়ি ঘুরছে। আশ্চর্য হলাম এইজন্য যে বিবিস দেখার পর আমি অরূপের কবিতা পড়তে বসলাম, সুস্নাত দিয়েছে যেভাবে একগোছা প্রিন্ট-আউট, পড়তে পড়তে মনে হল এ-কবিতাগুলি ছুটছে, আগাগোড়া চলমান সিনেমা।

অরূপের জন্ম ১৯৬১। পঞ্চান্ন বছর বয়সি যে কবিতাপ্রয়াসীর একটিও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, তার এতাবৎ লেখালেখির (কবিতা) বোধ করি নির্বাচিত অংশ, যা আমি প্রিন্ট-আউট হিসেবে পেয়েছি, গুনে দেখিনি, তবে তা থেকে তিনটি কাব্যগ্রন্থ হতে পারে। পঞ্চান্ন বছর বয়সি কবিতাপ্রয়াসী (কাব্যগ্রন্থ) প্রকাশের ইচ্ছা দমন করে কেবল 'তাঁতঘর একুশ শতক' নামক পত্রটি সম্পাদন করে গিয়েছে, এ বড়ো বিস্ময়ের। অধিক আশ্চর্যের বিষয় হল মধ্যবয়সি এই কবিতাপ্রয়াসীর সম্ভাব্য তিনটি কাব্যগ্রন্থ বা এই এখন আমার নিকটে থাকা একগোছা প্রিন্ট-আউট— চলমান।

যেহেতু বই বের হয়নি, এই এখন অরূপ আসকে, তাহলে, চলমান অশরীরী বলতে পারি।

অরূপ আসকে আমি অনেকদিনই চিনি। সম্ভবত বিগত নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা বইমেলায় তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, *তাঁতঘর একুশ শতক* পত্রিকার টেবিলে সে বসেছিল। হুগলির গঙ্গাতীরবর্তী শহরগুলির পশ্চিমে ডানকুনি থেকে পুরশুড়া পর্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও গঞ্জগুলি। আমাদের এদিকটায়, অর্থাৎ শ্রীরামপুরের দিকে ডানকুনির আশপাশের কোনো গঞ্জে অরূপদের আদি বাসস্থান, এই অংশের সঙ্গে কলকাতার নিকট যোগাযোগ। তবে অরূপের সঙ্গে আমার হুগলিতে কোথাও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, তার সঙ্গে আমার যা দেখাশোনা সবই কলকাতার বইমেলায়, তবে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়।

কলকাতা বইমেলায় মধ্য নব্বই-এর দশকে যখন তার সঙ্গে আমার আলাপ, তখন ইতিউতি লিটল ম্যাগাজিনে, *দাহপত্র*, *রক্তমাংস*, *বাল্মিকী*, *তৃণাঙ্কুর*, *কৃত্তিবাস*— এসব নামি ছোটো পত্রিকায় অরূপের কবিতা পড়ছি। কিন্তু ব্যক্তিগত



তাঁতঘর একুশ শতক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা

পরিচয় থাকলেও, সেই পাঠে এই কবি বা তার কবিতা সম্পর্কে পাঠক আমার মনে কোনো ধারণা ফুটে ওঠেনি, বলা যায় সেসময় কবিতা রচনাকারী হিসেবে অরূপ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অথচ ব্যক্তি অরূপ বৎসর ব্যবধানে এক-একবার বইমেলায় দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও খুবই কাছের জন হয়ে গেছে। একত্রে তার অনেকগুলি, বোধ করি শুরু থেকে এ-পর্যন্ত (প্রিন্ট-আউটের শেষাংশে হাতে-লেখা ফটোকপিও রয়েছে) শতাধিক কবিতা পড়ে যে-ধারণা তৈরি হল, অতি সংক্ষিপ্তাকারে একটি দু-টি শব্দে তা বলা যায়—

১. ও উড়ু উড়ু
২. তুমুল স্ফূর্ত

বলতে কী, এই সময়ের বাংলা কবিতায় এমন স্ফূর্তি বড়ো-একটা দেখিনি। এমন অবাধ গতি, এত স্ফূর্তি, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা বললে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেই মনে পড়ে। ঈষৎভাবে হলেও অরূপ শক্তিরই গ্রামীণ সংস্করণ, সপ্রশ্ন ভাবছি আমি।

স্কাই-ওয়াকের কিনার থেকে
নীলের ছটা
আলোর জটা
প্রবীণ ট্রামের পাকস্থলী মুচড়ে ওঠে
কোথাও কি নেই— তাজা বাতাস
রোমান্স ভরা?

— লিখেছে অরূপ, তার *কলকাতা* ২০১৬ কবিতায়।

আমাদের পশ্চিমে যে গ্রাম, দ্রুত সেগুলি গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে নগর ধাঁচের হয়ে উঠছে, হুগলির গঙ্গাতীরের প্রাচীন নগরগুলির চেয়ে ডানকুনি ও তার আশপাশের অঞ্চল অনেক আধুনিক, হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়েতে মসমস। অরূপের এই পঁচিশ-তিরিশ বছরের শতাধিক কবিতায় এই আবহাওয়া ভরপুর।

অরূপের এই শতাধিক কবিতা আমি যেভাবে পেয়েছি, তা যেভাবে সাজানো আছে, তাতে পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে, এটা ধরে নিয়ে অরূপের কবিতার সূচনাপর্ব থেকে এ-পর্যন্ত গ্রামজীবনের ওই পরিবর্তন, অর্থাৎ ওই শহরের স্পর্শ-লাগা সময়ের প্রলেপ রয়েছে। এর নমুনা যথেষ্টই দেওয়া যেতে পারে। আমার হাতে যে প্রিন্ট-আউট ও শেষাংশের হাতে-লেখার ফটোকপি রয়েছে তা থেকেই উল্লেখ করছি, এই শতাধিক কবিতার মধ্যে অরূপের দ্বিতীয় কবিতাটি *চলো যাই...*—

পুঁইমাচা সাদা জবা ধানের মড়াই
মাসান্তের মুদিখানা হিসেবের গরমিল
পড়োশির লাল চোখ
পার্টির জার্সি গায়ে জমির দালাল
থাক, পড়ে থাক
...

প্রিন্ট-আউটের মাঝামাঝি জায়গায় অরূপের *হাবাগোবা লোকের গল্প* কবিতাটিতে রয়েছে—

হাবাগোবা লোকেরা ধার করে বাড়িতে টিভি কেনে,
কিন্তু নিজে দ্যাখে না।
শুধু মাঝে মাঝে ছুটির দিনে
ছাদের মাথায় অ্যানটেনাতে মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে
শেষ পৌষের বিকেলে হাবাগোবা লোকের বউটি যখন
তার ফুটফুটে কিশোরী কন্যাটিকে নিয়ে
দাঁড়ায় তাদের সামান্য বাগানে, ঠিক তখন হাবাগোবা লোক
মাথা নিচু করে বেগুনগাছের মাটি আলগা করে
...

একেবার শেষদিকে হাতে-লেখা কবিতার যে-ফটোকপি কয়েকটি রয়েছে, তার ভেতর *প্রলাপ* কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

...নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে তোমার ডানার ঠিক
নীচে অবিরাম বেজে চলা জগঝম্প কাড়া-নাকাড়া
খোল-করতালের মাঝে নিরীহ আড়বাঁশির আজ
আর কোনো জায়গা নেই। আজ শুধুই রক্ষিত
বস্ত্রালয়, শুধুই হট-অয়েল ট্রিটমেন্ট, মানিব্যাক
পলিসি...

অরূপ কবে থেকে লিখতে শুরু করেছে জানি না, তবে আমি অরূপের এ-সকল কবিতার ভেতর গত কয়েকটি দিন ও রাত ঘোরাঘুরি করে পেয়েছি আমাদের প্রাচীন গঙ্গাতীরস্থ নগরের পশ্চিমের পরিবর্তিত গ্রামগঞ্জের হাওয়া-বাতাস এবং তার ভেতর দিয়ে রয়ে যাওয়া ১৯৭৮... ১৯৮২... ১৯৮৬... ১৯৯৪... ২০০০... ২০০৯... ২০১২... ২০১৬— এসব সাল।

উৎপলকুমার বসু বলেছিলেন, কবিতার ইতিহাস টেকনিকের ইতিহাস। অরূপের এতগুলি কবিতা পড়ে আমার মনে হল, নিজস্বরকম টেকনিক অরূপ রপ্ত করেছে। নগরঘেঁষা অঞ্চলে বসবাসকারী অরূপ লিখে গেছে স্ফূর্তিতে, শ্লেষের ভঙ্গি তার যথেষ্টরকম। তবে আমার মনে হয়েছে, যে-কথা আগে বলেছি, তার স্বভাব উড়ু উড়ু। তার কবিতা চলমান চলচ্চিত্রের মতো, আগে বলেছি বটে, তবে এই শতাধিক কবিতায় স্থানে স্থানে দেখেছি ছিন্নতা, যেন 'রিল কেটে গিয়েছে', কম বয়সে চলচ্চিত্র প্রদর্শনগৃহে এমনটি ঘটত। ধরে নেওয়া যায় তখন অরূপ অন্য কোনোরূপ কর্মে ব্যাপৃত ছিল। স্ফূর্ত, উড়ু উড়ু স্বভাবের বলেই অরূপ আসের কবিতাপ্রয়াসের ধরনে নিখুঁতের সাধনা নেই, পরিশীলিত হওয়া, সযত্ন হওয়া— এসবও তার ধাতে নেই। অরূপের শতাধিক কবিতাতে আমি কোথাও কোনো ঘোরের হদিশ পাইনি। তাতে কী! কবিতা এমনই কুহককন্যা যে বেপরোয়া দাপাদাপিতেও ইশারা ঘনিয়ে তোলে। সে বড়ো শক্তির কাজ।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

‘নিজেকে কখনো কবি মনে করি না। কবিতাকর্মী ভাবি। আমরা ওই কাঠবিড়ালিগুলো— আমরা মূলচরিত্র নই।’

ক থো প ক থ ন

অরূপ আস

কীভাবে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতা? বিস্মৃত মানুষজন কীভাবে জমি খুঁজে পায় সেই কাব্যশরীরে? কবিতা লেখা থেকে পত্রিকা সম্পাদনা। *বোধশব্দ*-র পক্ষ থেকে কবি অরূপ আসের সঙ্গে নানা কথায় **বরুণ চট্টোপাধ্যায়**।

***বোধশব্দ*-র এই সংখ্যা যাঁদের নিয়ে, ভেবে দেখলে অনেক কবির চেয়েই তুলনামূলকভাবে তাঁদের কবিতা হাতে পাওয়া কঠিন। তন্ময়দার শেষ বইটা বাদে বাকিগুলো পাওয়া যায় না, রঞ্জনদার শেষ বইও অনেকদিন আগে বেরিয়েছে এবং আপনার আজ পর্যন্ত কোনো বই নেই। অথচ আপনি *তাঁতঘর একুশ শতক* পত্রিকা সম্পাদনা করছেন বহুকাল— শুরুতে যার পরিচিতি ছিল কবিতার পত্রিকা হিসেবেই। তাহলে অদ্যাবধি আপনার কোনো বই প্রকাশ না করার কারণ কী?**

নিজের কবিতা নিজেই গ্রন্থাকারে বার করব, এটা আমার মনে হয়নি। ক্লাস ইলেভেন-টুয়েলভ থেকেই আমি পত্রিকা করছি। প্রথমে আমার ধনেখালির বন্ধুদের নিয়ে *জাতক* পত্রিকা, পরবর্তীকালে *অঙ্গীকার* বলে একটা পত্রিকা— তারপর ‘তাঁতঘর’-টা শুরু করি। এবং সেখানে শুধু কবিতা নয়— শুধু কবিতা ছিল প্রথম সংখ্যায়। তারপর কবিতা এবং গদ্য— মানে, সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার যে বিষয়গুলো, সেসব বিষয়ের উপর গদ্য— এভাবেই ‘তাঁতঘর’ বেরিয়ে আসছিল।

আপনি দেখবেন, আমার লেখা কিন্তু খুব কম। ভীষণ রকমের কম— হয়তো পত্রিকাটা করতে গিয়েই...। আরেকটা কথা বলে নিই, আমি কিন্তু নিজেকে কখনো কবি মনে করি না। কবিতাকর্মী ভাবি। রামায়ণে যে-সেতুবন্ধের কথা রয়েছে— সেই কাঠবিড়ালি, যে গায়ে বালি মেখে আবার গিয়ে সেতুর গায়ে ঝাড়ছে, বালিটা পড়ছে...। আমরা ওই কাঠবিড়ালিগুলো— কেউ আমরা মূলচরিত্র নই।

কিন্তু ধরা যাক, অন্য কেউ যদি প্রস্তাব দিতেন— আপনার একটা বই করবে। সেক্ষেত্রে?

দেখুন, বই করার কথা, লিটল ম্যাগাজিন করে এমন একজন দু-জন কখনো বলেছে— আমি তাদের এড়িয়ে গিয়েছি। তারপর তারাও আর কেউ কিছু বলেনি; আমারও নিজের কাজ, ব্যক্তিগত জীবনযাপন... এসব করতে গিয়ে আর সময় হয়নি। কিন্তু কবিতা লিখতে ভালো লেগেছে সবসময়ই। এবং কবিতা লিখতে না-পারার যন্ত্রণাও পেয়েছি।

যদি কখনো কেউ সেভাবে জোর করত— আপনি কি রাজি হতেন?

সেটা আজকে বসে... না, রাজি হতাম না, সে-কথা বলা যায় না। কারণ বইটা করলে একটা জিনিস হয়, যেটা হচ্ছে, ছাপা অবস্থাতে লেখাগুলো সব একসঙ্গে দেখা যায়। অনেক বছর আগে, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন— এই, তোমার কোনো বই নেই? থাকলে, একসঙ্গে সবকটা কবিতা পড়লে একটা ধারণা করা যেত। আমি বললাম— না, আমার কোনো বই নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী, এখন যেটা হচ্ছে, যারা লিটল ম্যাগাজিন করছে তারা নিজেই নিজের বই করছে। এইটা আমার কখনো মনে হয়নি। আমি আমার সমস্ত অর্থ, শ্রম ঢেলে দিয়ে কাগজটাকে ঠিকঠাক মতো করার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি। জানি না, সেটা সময় বলবে যে কতখানি কী কাজ হয়েছে।

যেটা আপনি এইমাত্র বললেন, আমি হয়তো ঠিক এই সূত্রটাই খুঁজছিলাম— একসঙ্গে অনেকগুলো কবিতা পাওয়া যেত একটা বই থাকলে। আমি যখন প্রথম একসঙ্গে আপনার অনেকগুলো কবিতা পড়লাম, যেমন সিনেমায় একজন পরিচালককে সমগ্রভাবে পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করি একটা রেট্রোস্পেকটিভের, আমার অভিজ্ঞতাটা অনেকটা ওই রেট্রোস্পেকটিভের মতোই হল। সেখান থেকেই আমি খুব সুনির্দিষ্ট একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, নিজের ভালোলাগার জায়গা থেকেও খানিকটা— বেশ কিছু লেখায় প্রত্যক্ষ বা একটু সাংকেতিকভাবেও *রক্তকরবী*-র রেফারেন্স আসছে। এই যে *রক্তকরবী* একটা অবসেশনের মতো লালন করেন— নাটকটা আপনাকে ছাড়ছে না— এই ব্যাপারটা একটু বিশদে জানতে চাই।

দেখুন, বিশদ কী বলছেন, আমি জানি না। আসলে কবিতা লেখা আমার কাছে না— কী বলব— একটা ভাবনা মাথায় এল হয়তো...। প্রতিদিনের যাপন, ভাবনা, মানুষজনের কথা— এইসব থেকেই কবিতা লেখার রসদটা পাই। *রক্তকরবী* আমার খুব প্রিয় নাটক। যেমন, আমি একবার পাচুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— *রক্তকরবী*-র সাথে *মডার্ন টাইমস*-এর আমি একটা মিল খুঁজে পাই। এটা কেন? যেমন, বলা হত রবীন্দ্রনাথের নাটক নাকি স্টেজের উপযোগী নয়! তা শম্ভুবাবু তো সেটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, কাঁচের বাসনের মতো। আসলে করার যোগ্য লোক ছিল না— এখনও করা যায়।

অবশ্যই, অবশ্যই।

হ্যাঁ, *রক্তকরবী* খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয় আজকের দিনে। বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। চরিত্র, তার সংলাপ, তার ভাবনা, তার সুর...

একটা লেখায় যেমন আপনি শুরুতে অচিন্ত্যকুমারকে কোট করছেন। তারপর নানাভাবে *রক্তকরবী* যাচ্ছে-আসছে। সেখান থেকে পার্বতী-চন্দ্রমুখী, মানে *দেবদাস*-এ যাচ্ছেন। একটিই কবিতার মধ্যে এতগুলো পাঠ, পাঠ-স্মৃতি— এইটাকে মেলান কী করে? আপনার প্রকরণকে কি এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি?

প্রকরণকে দেখতে পাচ্ছি? সেটা তো পাঠক বলবে। দেখুন, আমি খুব সচেতনভাবে এইটা করলাম, এইটা এল খুব বাঁধাছাঁদা করে, খুব প্ল্যান করে— কবিতা আমার ধারণা সেইভাবে হয় না। একদমই হয় না কখনো। এগুলো এসে গেছে, স্পনটেনিয়াসলি এসে গেছে।

যদি তাই হয়, একটা জিনিস খেয়াল করছি— আপনার কবিতায় সাংঘাতিক অ্যালুশন! একটা লেখার মধ্যে অন্য লেখা— লেখাগুলোকে খুব দুমড়ে-মুচড়ে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, *ভাঙাগান* কিংবা *রবিবারের সকাল*। 'বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতোন...'— শুরু হল এইভাবে। তেমনি *কাঁদো নদী কাঁদো*। 'চোখ মুছছে ঋত্বিকের ক্যামেরা'। মানে, আপনার পাঠের স্মৃতি, আপনার সাহিত্যের স্মৃতি আপনি বার বার কবিতার মধ্যে নিয়ে আসছেন।

হ্যাঁ, সে তো এসেই যায়।

এই সূত্রে যদি আমরা জেনে নিই— বাল্যকাল থেকে আপনি কীভাবে পড়ছেন?

আমি বলি। আমি একটু *ভাঙাগান*-টা নিয়ে বলতে চাই। আমার বেশিরভাগ বন্ধুবান্ধব গানের জগতের লোক। গান নিয়ে যাপন— মানে, গানযাপন করে এমন লোকের সঙ্গে আমার অনেক সময় কেটেছে। সেই ছোটোবেলা থেকে। দেখবেন, আমাদের মফস্‌সলের যে সংগীতচর্চা— আপনি আমার কবিতাগুলো পড়েছেন নিশ্চয়ই, আমি আমার কবিতায় তাহাদের কথাই লিখতে চাই। আমার কাল্পনিক বইটার নাম ছিল— 'তার কথা, তাহাদের কথা'। আমি গল্প লিখতে পারি না। আমার কবিতাগুলি গল্প, না কবিতা হয়ে ওঠে, সেটা আপনারা বলবেন। যাঁরা পাঠক, পড়বেন। পড়েছেন বা পরে পড়বেন— তাঁরা বলবেন। *ভাঙাগান* কবিতাটি হল— একজন মাস্টারমশাই, যিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশন করে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়ান। 'প্রতিভার জ্ঞাতি ভাইবোন'— এটা একদম জ্যান্ত চরিত্র। সে দীর্ঘদিন ধরে একেবারে আমার মাথার ভিতরে কুরে কুরে খাচ্ছে। তখন কবিতাটা এসে গেল।

আপনি যে বলছেন, গানের বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো— গান আমি খুব শুনি, শুনতে ভালোবাসি— গাইতে পারি না। আমার ছেলে গান গায়। আমার বোন খুব ভালো গান গায়। এবং আমার বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই গানের। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করি, যারা কবিতা লেখে বা নাটক করে, তারা আর অন্য জিনিসটা করে না। এটা আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই একদম নেই। শুধু পড়ব, গানটা জানব না, ছবিটা জানব না, সিনেমাটা দেখব না, নাটকটা জানব না— এটা আমি কখনো করিনি। আমার লেখাটা লেখা হয়েছে কি না, সেটা অন্য প্রশ্ন। গানের ব্যাপারটা এসেছে আমি খুব ভালোবাসি বলেই। একদম চিন্তা করে কবিতায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, এমন কিন্তু নয়।

এটা এসে যায়...?

এসে যায়। এই যে আপনি পাঠ-স্মৃতি বলছেন... ওই, এসে গেছে। আমি কখনো প্ল্যান করে তাদের আনিনি। বললামই তো, কবিতা কখনো প্ল্যান করে লেখা যায় না। আসে, এসে যায়। ওই পাঠ-স্মৃতিগুলো পর পর এসে গেছে।

আমি মফস্‌সলের ছেলে, খুব বড়ো লাইব্রেরি পাইনি কখনো— কিন্তু ওই বন্ধুদের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক পেয়েছি। টুকটাক পড়েছি— আমি নিজেকে মূর্খই মনে করি আজও। তবে এই সামান্য পড়াগুলো কখনো কোথাও মাথার মধ্যে থেকে যায়— মাথার ভিতরে... এক বোধ কাজ করে।

এই কথাগুলো থেকে একটা জায়গায় আমরা যেতে পারি বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে আপনি প্রথম জানালেন আপনি কবিতাকর্মী। তারপর কাঠবিড়ালি এল, মফস্‌সল এল। এইখান থেকে যদি আমি 'তাঁতঘর' নামটাকে ধরি— শাড়ি তো একটা ফিনিশড প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা দেখি, তাঁতঘর কিন্তু তার কাঁচামালের এলাকা— যেখানে জিনিসটা গড়ে ওঠে, হয়ে ওঠে...

একদম!

আর, আমি যতদূর জানি, 'আস' পদবিটা তন্তুবায় গোষ্ঠীর পদবি— এর সঙ্গে কি 'তাঁতঘর'-এর কোনো সম্পর্ক আছে? তা ছাড়াও দেখছি ধনেখালি... মানে, এইসব মিলিয়ে *তাঁতঘর একুশ শতক* কি রান্নাঘর?

আমি তন্তুবায় নই জাতিতে। কিন্তু তন্তুবায়দের 'আস' পদবি আছে। আর হ্যাঁ, রান্নাঘর। ঠিক। আসলে, আমি বলি, যে সিনেমা বানাচ্ছে, ছবি আঁকছে, কবিতা লিখছে— সে তো একটা তাঁতঘরেই আছে! সেই ঘরটাকে ধরার চিন্তা থেকেই আমার শুরু আর কী। আপনি যখন 'তাঁতঘর' নিয়ে জানতে চাইলেন, এই প্রশ্নটা যখন এসেই গেছে, বলে দিই। সেটা হচ্ছে, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাটাই কবিতার সংখ্যা ছিল। সেইসময় পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা কবিতা লিখছেন— একদম অনামি থেকে, যদি প্রথম সংখ্যাটা দেখেন কখনো, হাল আমলে যাঁদের নাম হয়েছে, তাঁরাও আছেন। মানে, ছুঁতমার্গ নেই কোনো। অমুক ওই পত্রিকায় লেখেন, অমুক জনপ্রিয়— সুতরাং তাঁর নামটা বাদ যাবে— তা নয়। আস্তে আস্তে পত্রিকাটা করতে করতে পাঠক গ্রহণ করল। নাটক নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ ছাপা হল। আজকে যাঁরা নামেই পরিচিত— এমন অনেক গীতিকার, সেদিন তাঁদের কেউ চিনত না, তাদের লেখা— আজকে যাঁরা নাটকে অনেক উঁচুতে, অনেক নামকরা ব্যক্তি, আমি নামগুলো বলছি না, তাঁরা বেশিরভাগই 'তাঁতঘর'-এ লিখেছেন। এরকম করতে করতেই... আসলে, বয়স বাড়লে তো চোখটা বদলায়। ভাবনাটাও। আমার নিজেকে কালচারাল হিসট্রির লোক মনে হল। আমার মনে হল, এই কাজগুলো পড়ে রয়েছে। তখন আমি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দিয়ে বিশেষ সংখ্যা করা শুরু করলাম। তারপর অনেকগুলো বিশেষ সংখ্যা হল— পালাসম্রাট ব্রজেন দে, মিউজিকের উপর পান্নালাল ঘোষ— মিউজিকের উপর তো বেশ কয়েকটা সংখ্যা হল। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি হঠাৎ মিউজিক নিয়ে খেপলেন কেন! আমি বললাম, এই মাঠটায় কেউ খেলছে না— এই মাঠটা ফাঁকা তো— সেইজন্য। এখন যাঁরা কবিতা লেখেন— বা, যাঁদের প্রচুর নাম— তাঁরা অনেকেই এখন আর 'তাঁতঘর' পত্রিকায় কবিতা ছাপা হয় না বলে দেখা হলেও কথা বলেন না। এটাও সম্পাদক সহ্য করে। মাথা নিচু করে সহ্য করে। কমবয়সি অনেকে, এখন হয়তো তাঁরা পুরস্কৃত, বিদেশ গেছে, তাঁরা আর চিনতে পারেন না। তাতেও কোনো অসুবিধে নেই, কারণ আমি এখন যাঁদের নিয়ে কাজ করি, তাঁরা কেউ কোনো পুরস্কার কমিটিতে নেই।

হ্যাঁ, আপনার একটা উদাসীনতার বর্ম আছে, লক্ষ করেছি।

উদাসীনতার বর্ম মানে... ওই যে, নিজের লেখা নিজে ছাপিয়ে বই বের করব, এটা আমার কখনো মনে হয়নি। তবে ওই যে আপনি বললেন না— অনেকে না হয়তো, কেউ কেউ, আমার কবিতার পাঠক দু-চারজন হয়তো বলেন, ওঃ, বই নেই! বইটা থাকলে ভালো হত, সব তো দেখা যায় না!

এবার একটু অন্যদিকে যেতে চাই। দুর্গত প্রান্তিক আউটসাইডার, যাঁরা খুব মূলস্রোতে নেই, আপনার কবিতায় তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়। ধরা যাক, *উঠি না উঠি* কবিতাটা। কিংবা, *হাবাগোবা লোকের গল্প*। এই যে কানু পাগল, হাবাগোবা লোক— এঁরাও এসে পড়ছেন। হয়তো সচেতনভাবে নয়। আপনার

স্মৃতির মধ্যে পরতে পরতে তাঁরা রয়েছেন। তাঁদের আপনি এনে ফেলছেন। এই যে জীবনের প্রতি মমতা বা আত্মিক একটা জায়গা...

সেটা তো নিশ্চিতভাবেই আছে। আমি গ্রামের মানুষ এবং এইসব মানুষের কথা কোনোটাই আমি মেক করিনি। এঁরা কিন্তু আমার দেখা। *মোশন মাস্টারের বউ*— ধনেখালি, যেখানে আমার বাড়ি, যাত্রার ভীষণ চর্চা সেখানে। ছোটোবেলা থেকেই আমি যাত্রা দেখে আসছি। আমাদের বাবা-জ্যাঠারা যাত্রা করতেন। যাত্রার এখনকার অবস্থা, এগুলো আমার সম্যকভাবে জানা— সেই জায়গা থেকেই *মোশন মাস্টারের বউ* কবিতাটা আসে।

এটা হয়তো খুবই অকবিজনোচিত প্রশ্ন, এই যে কানুপাগল— এঁরা কি কোনো বাস্তব চরিত্র— ওই মাস্টারমশাইয়ের মতো?

নিশ্চয়ই! এঁরা ছিলেন— এঁরা হারিয়ে গেছেন। রণজিৎ দাশের একটা কবিতা আছে না— ''ক্ষ্যাপা হরেন, যে জানে, চৈত্রদুপুরের এলোমেলো ঘূর্ণিতে শহরের রাস্তায় যেসব ছেঁড়া কাগজ ওড়ে, সেগুলিতে কি লেখা থাকে। 'কি লেখা থাকে, ভাই হরেন?' গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে, অথচ একটু উদাসীন গলায় হরেন উত্তর দেয়, 'মালতী বসু'।''

এই সূত্রে একটা কথা বলছি, 'তাঁতঘর'-এ যাঁরা একসময়ে লিখতেন, তারপর তাঁরা নাটকের খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তাঁরা বিদেশ যাচ্ছেন, অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ইত্যাদি— একটা দূরত্ব যেন তৈরি হচ্ছে, 'তাঁতঘর' ও তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন পালটে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখছি, হাবাগোবা লোকেরা হাবাগোবা হয়েই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে— অর্থাৎ তারা কোয়ালিফাই করেই হাবাগোবা— হাবাগোবামিটা তাদের যোগ্যতা—

হুঁ। এটা তাদের অসম্পূর্ণতা নয়। এদের দেখেছি তো! এরা আমার খুব কাছেই থাকে। আমার যাপনের সঙ্গেই এদের আমি দেখেছি।

এবং সেই দেখা এখনও চলছে?

হ্যাঁ— নিশ্চয়ই। আসলে কবিতাটা খাতায় নয়, প্রথমে মাথায় লেখা হয়। ট্রেনে যাচ্ছি, ধরুন। বা, আমি কোথাও গেলে বাজারহাট-দোকান এগুলো খুব পছন্দ করি। আমার খুব ভালো লাগে। তো, মূল খসড়াটা ওই মুহূর্ত থেকে তৈরি হতে থাকে। মানে, অন্তত প্রথম লাইনটা তো আসেই...

মানে, মাথার ভেতর একটা তাঁতঘর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?

তা বলতে পারেন। আবার সবসময় কাগজে ওগরানো না হলে, হয়তো মিলিয়ে গেছে। কারণ ওটা আমার কন্ট্রোলে নেই।

তার মানে, কোথাও একটা ইন্সপায়ার্ড কবিতা। একটা মুহূর্ত নিজেই কবিতা হবে বলে ঠিক করল আপনার মাধ্যমে?

হ্যাঁ, একদম।

কিন্তু, আরেকটা জিনিস, অন্তত আপাতভাবে মনে হচ্ছে, এর বিরোধী। আপনার খুব সচেতন কিছু নির্মাণ আছে। তাঁতঘরে তো একটা প্যাটার্ন লাগে, সেটাকে মেনটেইন করতে হয়। একটা সহজ উদাহরণ বলছি— *চূর্ণবিচূর্ণ* কবিতাটা। কিংবা, *ত্রিবেণী* কবিতাটা।

ত্রিবেণী কবিতাটা প্রায় বছর দশ-পনেরো আগে লেখা। আমি তখন বাঁশবেড়িয়ায়— হ্যাঁ, পনেরো বছর আগে লেখা। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার চাকরি করি। প্রতিদিন ত্রিবেণী যেতাম। লেখাগুলো আলাদা আলাদা হয়েছিল। কখনো দু-একটা কোনো পত্রিকাতে বেরিয়েওছিল।

আচ্ছা। এবার কিছু আত্মজৈবনিক প্রশ্নে যাওয়া যাক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি এসে-যাওয়া বা স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলছেন। আপনার প্রজন্মের কারো পক্ষেই রাজনীতিমুক্ত বা রাজনীতি-উদাসীন হওয়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। আপনার একষট্টিতে জন্ম। সত্তর দশকে ন-দশ বছর বয়স। আবার পুরো একটা বাম আমল দেখলেন। তারপর পালাবদল হল। আপনি গ্রামের ছেলে, ট্রেইন্ড ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করছেন পাবলিক সেক্টরে। তাহলে তার একটা আলাদা বোঝাপড়া থাকার কথা। সরকারের দপ্তরগুলোকেও দেখেছেন। তার মানে, রাজনীতিকে সরাসরি বেশ কয়েকটা লেয়ারে আপনি পাচ্ছেন। এর সঙ্গে আপনার কবিতার জগতের সম্পর্কটা যদি বলেন।

খুবই ক্ষীণ! কারণ, ওই ব্যাপারগুলো আমি খুব কম বুঝি, খুব কম পড়াশোনা। তবে আমার মনে হয় যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো লোককে আমাদের ভারতের রাজনীতি গ্রহণ করেনি। আর, অতিবাম ইত্যাদিকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি পরিষ্কার বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের মাটিতে মানুষ খুন করে কোনো রাজনীতি চলতে পারে না। চলতে পারে না। এ-দেশে সেটা সম্ভব নয়।

তবে, কোনো কোনো লেখায় রাজনীতির ওই দেখাটা এসেছে। এভাবে বলতে চাই না, আপনি জানতে চাইছেন বলেই বলছি। যেমন, *দেশ-গাঁয়ের কথা* কবিতাটি। বর্ধমান থেকে কাটোয়ার দিকে যায় যে-অঞ্চলটা— ভাতার— ওখানে যা চলছিল, যা চলে, এসব ঘটনাগুলো শোনা-দেখা-জানা— এইসব মিলিয়েই লেখাটা হল। আমি তো কোনো বিপ্লব করতে পারব না, বন্দুক নিয়েও দাঁড়াতে পারিনি, পারব না— এই লেখার মধ্যে দিয়ে যদি সেটা এসে যায়...

একটা কথা বলি, হয়তো খুবই অকবিজনোচিত। *ভূমিপুত্র* কবিতায় দেখলাম তুষার কাঞ্জিলালকে। কয়েকটা ক্যাটাগরি দেখছি— কমলকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্বাগতালক্ষ্মী— আবার তুষার কাঞ্জিলাল। ব্যক্তিনাম এসে পড়ছে, বেশ বোধগম্যভাবে সুসংগত— তথ্যের দিক থেকেও। 'ভূমিপুত্র' নামটাও খুব মানানসই। ওঁর সঙ্গে কি...

না। ওঁর সঙ্গে কখনোই আলাপ-পরিচয় হয়নি। আমার ধারণা উনিও কখনো এই কবিতাটা চোখেই দেখেননি। কিন্তু ওঁর কাজ সম্পর্কে আমি জেনেছি। এটা একটা ট্রিবিউট বলতে পারেন। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিয়ে কবিতাটা, সেটাও একটা ট্রিবিউট বলতে পারেন। আসলে, *তিতাস একটি নদীর নাম* আমার খুব প্রিয় সিনেমা।

সেই উত্তাপ কবিতাটায় বেশ ভালোভাবেই আছে। আবার *গতরাতের স্বপ্ন* কবিতায় দেখছি একটা সুপ্রিম কোর্টের রায়। সেটাকে ধরলেন। এখন ওই স্মৃতিপথে ফিরে গিয়ে কবিতাটা হয়ে ওঠার ঘটনাক্রমটা কি বলা সম্ভব?

ওই কবিতাটা লেখার কথা বলি। যখন আমি কবিতাটা লিখছি, আমি বাঁশবেড়িয়ায় থাকি, আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাঁশবেড়িয়ায় বাড়ির যিনি কর্তা, মহাদেব হালদার, তিনি মুর্শিদাবাদের লোক। তাঁর বৃদ্ধা মা ওই বাড়িতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই ইন্টার‍্যাকশন হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা, যেমন আলকাপ আমার খুব প্রিয়। অবশ্য *মায়ামৃদঙ্গ* সিনেমা দেখে আমি বেশ আহত হয়েছি। 'তিতাস'-এর মতো মহৎ আরেকটা কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের। আন্তর্জাতিক মানের কাজ হতেই পারত ওটা।

হয়তো এই ছবিটাকে একদম ভুলে গিয়ে নতুন করে কারো ভাবা উচিত—

ঝাঁকসু-র শতবর্ষে আমি পত্রিকা করেছিলাম। আমার 'তাঁতঘর' পত্রিকায় দেখবেন একটা উৎসর্গপত্র থাকে। আমাদের দেখে এখন অনেকে করছে...

এটা তো *বোধশব্দ*-র 'সৌজন্য সংখ্যা' নিয়ে কাজটিতে ধরাও হয়েছিল।

হ্যাঁ। পত্রিকা করতে একটা পরিশ্রম তো হয়, সেই পরিশ্রম উৎসর্গ করলাম। সৈয়দ মুজতবা সিরাজের কাছেই জানতে চেয়েছিলাম, ঝাঁকসুর নামটা কী লিখব? সিরাজ বললেন— লেখো ধনঞ্জয় সরকার ব্রাকেটে মণ্ডল।

এটা তো জানিই যে, এই আলকাপের ব্যাপারটা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া এবং সেই ঝগড়ার মধ্যে কখনো রাষ্ট্র ও সমাজ ঢুকে পড়ে। এই জিনিসটা আমাকে খুব ভাবায়। আমার সমস্ত কবিতার মধ্যে, যদি মাত্র একটা, একটা কবিতাও বাছতে বলেন, তাহলে আমার ধারণা এই কবিতাটাকে বাদ দিতে পারব না।

মানে, এই *গতরাতের স্বপ্ন*?
হ্যাঁ। *গতরাতের স্বপ্ন*। কেন জানি না, আমার মনে হয়েছে, এরকম কবিতা আমি বোধহয় আর কোনোদিন লিখতে পারব না।

এটা কোন সময় লেখা?
তা... সতেরো-আঠারো বছর আগে। রহিমপুর বলে একটা গ্রাম আছে। ওই যে মাসিমার সঙ্গে আমার গল্প হত, গল্প করতাম আলকাপের। মাসিমা বললেন, আলকাপ তো পঞ্চরস। জানতে চাইলাম, কোন গ্রামের আলকাপ সবচেয়ে ভালো? মাসিমা অনেক ভাবলেন, তারপর বললেন— রহিমপুরের আলকাপ! ওই নামটা ওর থেকে ঢুকে গেল। ঝাঁকসু দারুণ ক্যারেক্টার। বাংলা সাহিত্যে *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসটাও সাংঘাতিক!

দুটো জিনিস পাচ্ছি— এক হচ্ছে ধনেখালিতে জন্ম— যাত্রার জায়গা। আর একটা হল আলকাপ।
যাত্রা, নাটক এগুলো তো একদম ছোটোবেলা থেকেই আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমি ক্লাস টেনে পড়তে ধনেখালি থেকে অ্যাকাডেমি এসে নাটক দেখে লাস্ট ট্রেনে ফিরেছি। মফস্‌সলের ছেলে না-হলে বুঝতে পারবে না গঙ্গা পেরিয়ে ওই সময় কলকাতা আসা... তবে, আমার বাবা-মা আমায় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এসে *খড়ির গণ্ডি* দেখে যাচ্ছি রুদ্রপ্রসাদের... আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো খেদ হচ্ছে আমি স্টেজে শম্ভু মিত্রকে দেখেতে পাইনি। মায়ের সঙ্গে গিয়ে *তিন পয়সার পালা*-এ অজিতেশকে দেখেছি। অজিতেশ আমার খুব প্রিয় মানুষ। অজিতেশের প্রতি আমার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। ভীষণ। আমি এখনও অজিতেশকে স্বপ্নে দেখি। আমি রেডিয়ো নাটকেরও একেবারে পোকা ছিলাম, রেডিয়ো নাটকটা আমার জীবনের খুব বড়ো একটা ব্যাপার।

বুঝতে পারছি, আপনার প্রিয় জিনিসগুলো খুব বিদ্ধ করে আপনাকে। আপনি নিজেকে কবিতাকর্মী হিসেবেই জানাতে চেয়েছেন; কিন্তু পাবলিক পারফরম্যান্স— সেটা লোককলা হোক আলকাপের মতো, বা অ্যাকাডেমির নাটকই হোক— তাকেও আপনি ছাড়তে চাননি। সেই ছেলেবেলা থেকেই। ধনেখালি থেকে এসে যখন *খড়ির গণ্ডি* দেখছেন, কবিতা লেখা কি তখন চলছে?
না। আমি কবিতা লেখা শুরু করি... কী বলব... ওই যে প্রশ্ন থাকে— আপনি প্রথম কবে কবিতা লিখলেন! তো, ক্লাস এইটে প্রথম একটা পদ্য, তারপর ইলেভেন-টুয়েলভে কিছু— তার পরে শুরু হল। টুকটাক করে লেখা। এর মধ্যে আমার জীবনের একটা ঘটনা আছে। সেটা হচ্ছে, টুয়েলভের পর আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে, আজকের পরিভাষায় যাকে এনজিও বলে, কোনো সরকারি সাহায্য না নিয়ে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করলাম। ক্লাব মানে, কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করব, এইরকম একটা ভাব। সেটা নিয়ে আমি বহুবছর মেতেছিলাম। সেখানেই 'অঙ্গীকার' নামে একটা পত্রিকা করতাম। সংস্থাটা এখনও আছে ধনেখালিতে, আমি অবশ্য আর নেই সেটার সঙ্গে। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছে, বনভোজনের মেনু অনেকে মিলে করা যায়, কিন্তু সিরিয়াস কোনো কাগজ গণতান্ত্রিকতা বজায় রেখে করা যায় না।

একটা কথা জানতে চাই, *বোধশব্দ*-র সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি নিজের প্রয়োজনের তাগিদেও। *পারফেক্ট কোচিং সেন্টার*— একটা পছন্দের ক্রম তো সবাই ব্যক্তিগতভাবে কোথাও তৈরি করে নেয় বা তৈরি হয়ে যায়— আপনার এই গোটা বাণ্ডের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই *পারফেক্ট কোচিং সেন্টার* কবিতাটি। কেন জানতে চাইলে, সঠিক বলতে পারব না হয়তো— কিন্তু পড়ে শিহরিত হয়েছি! কবিতাটিতে যে বিরাট একটা বিস্তার তৈরি হচ্ছে— মানে, যাদের মধ্যে আপাতভাবে কোনো মিল থাকা সম্ভব না, এর মধ্যে দু-জন আপনার প্রাইভেট ক্যারেক্টার— মাধব স্যার আর প্রতিভাদি। কিন্তু গোবর গুহর বাইসেপ, গোষ্ঠ পালের খালি-পা— আবার হেমেন মজুমদার আর বেগম রোকেয়া— যাদের কোনো সূত্রেই গাঁথা যাবে না! এটা যদি একটু ডিক্ল্যাসিফাই করেন—
হাঃ হাঃ! এই কবিতাটা যে পড়ছে— ধরা যাক, সে কবিতার পাঠকটাটক নয়— তার মনে হবে কে গোষ্ঠ পাল? তার খালি-পা-টা কী? গোবর গুহটা কে? কবিতাটা বাদ দিয়ে, অর্থাৎ কবিকে বাদ দিয়ে— যদি একবার সে জানতে চায়, একটু জানতে চায়— তাহলেই বোধহয় কবিতাটা একভাবে অন্তত সফল। আর, কবিতাটার শেষ লাইনটা যদি পড়েন, সেটা বোধহয় একটা অন্য দুঃখের জায়গায় গিয়ে শেষ হচ্ছে...

এই কবিতাটার কিন্তু আবার একটা মিউজিক্যাল স্ট্রাকচার আছে?
আপনি এটাকে কী বলবেন আমি জানি না। কিন্তু কবিতার ফর্মটা সবসময় একরকম থাকবে কী করে! আর, এটা কবিতা হবে কি না, আমি কখনো ভাবিনি। এটাকে কবিতা বলে কি না, এসব কথা আমি ভাবিইনি। আমার মনে হয়েছে— আমি লিখেছি।

আবার অনেক লেখায় দেখছি প্রায় একজন পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার যেভাবে চিত্রনাট্য সাজান তাঁদের নিজস্ব ব্যাকরণ মেনে, কবিতাটা সেইভাবে গড়ে উঠছে। এই ফর্মটাকে ধরছেন কেন? এটা কি কোনো মানসিক ইচ্ছাপূরণের মতো?
একদম! এই যে দুটো শব্দ বললেন— মানসিক ইচ্ছাপূরণ। চিত্রনাট্যের আদলটা অনেক জায়গাতেই এসেছে। আর, সব কবিতা তো একই ফর্মে হয়ও না। লেখার ভাবনায় এবং লেখায় একটা ভিস্যুয়াল ফ্লো কাজ করে।

মানে, আপনি একটা দৃশ্য দেখছেন— পর পর শট ডিভিশন চলছে ভেতরে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কিন্তু সেটা বেরোল কবিতার ফর্মে! আচ্ছা এটা কি হয়, অরূপদা? ধরুন, একটা সিনেমা দেখছেন— বা, অজিতেশের বেদনাময় ওই মঞ্চ-উপস্থিতি— বা, দেখছেন রহিমপুরের আলকাপ— এইসময় সমান্তরালভাবে তাৎক্ষণিকভাবে মাথার ভেতরে ওই তাঁতটা চলতে শুরু করে কোথাও?
হ্যাঁ, তা করে। তবে করলেও কিন্তু আমি একটা জিনিস করি, সযত্নে করি, কিছু দেখে কিছু মনে হল— সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম— এটা করি না। ধরুন, আমি ট্রেনে যাচ্ছি— একটা লোক একটা কথা বলল— সেটাই আমার প্রথম লাইন হতে পারে! কিন্তু একটু সময় লাগে— সঙ্গে সঙ্গে করে ওঠা যায় না।

একদম শেষে একটা কাল্পনিক প্রশ্ন! ধরা যাক, এর উত্তরটাও একটা বাস্তব-পেরিয়ে-যাওয়া উত্তর হতে পারে। কেউ যদি আপনাকে একেবারে উপযুক্ত পরিকাঠামো দেয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট দেয়, টেকনিশিয়ান দেয়— এইসব চিত্রনাট্য থেকে কি আপনি ছবি করতে চান?
এরকম অনেক জিনিসই মাঝে মাঝে মাথায় আসে। হয়তো ছবি করে উঠতে পারছি না বলেই সেটা আবার কবিতার চেহারা নিয়ে নেয়। তবে, আবার বলছি, আই রিপিট, এসব যে একেবারে প্ল্যান করে করার মতো হয়, তা আমি বলব না।

তিনজন কবি

facebook.com/bodhshabdo

বিংশ সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ : পৌষ ১৪২৩, জানুয়ারি ২০১৭

বিনিময় মূল্য : ৭০ টাকা